কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

জুন 198

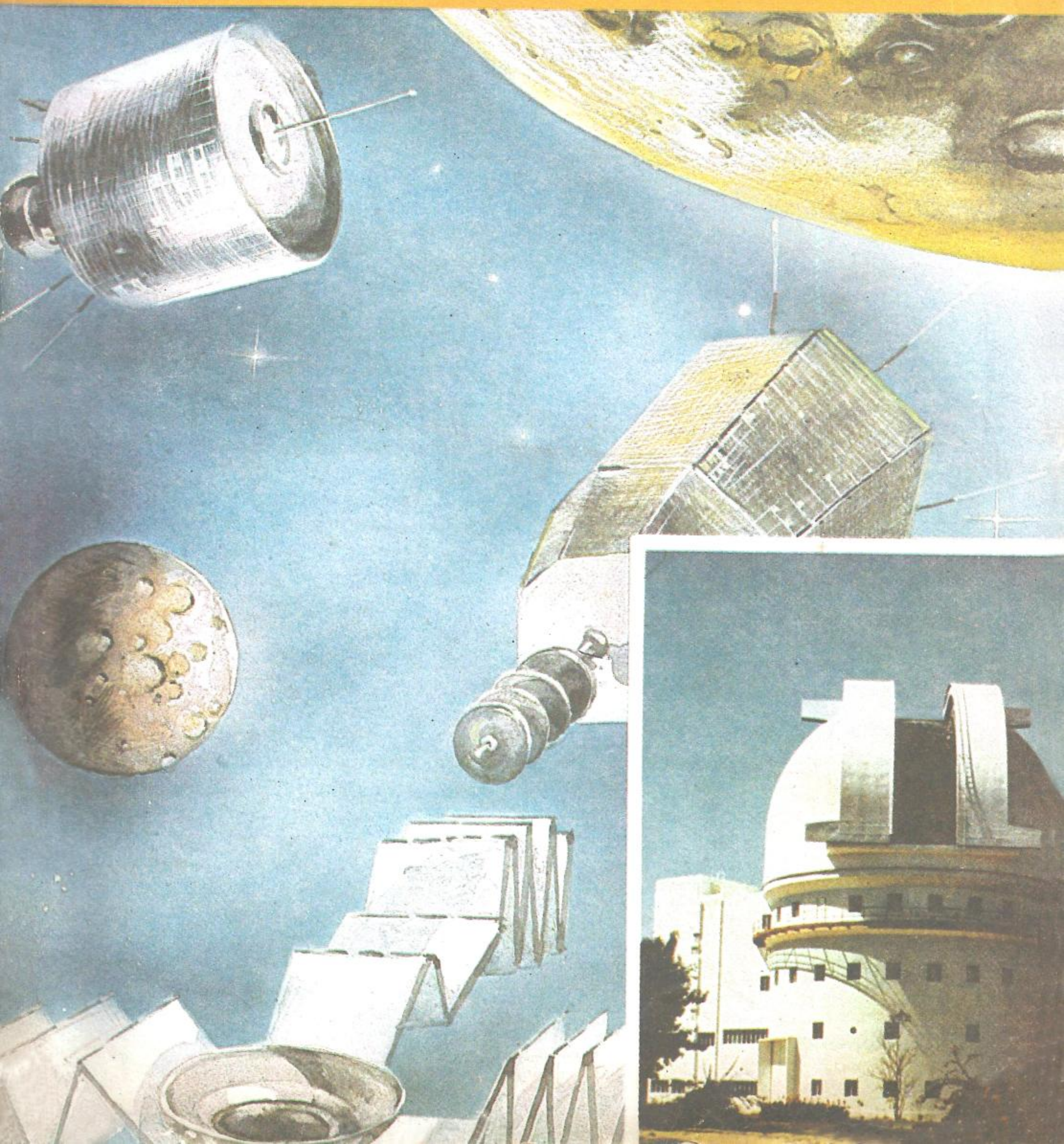

এক ডজন নতুন বই

পাঁচটি কিশোর ক্ল্যাসিকস্

অন্নদাশঙ্কর রায় ।। বিন্নি ধানের খই ৮
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ।। কিশোর গল্প সমগ্র ৩০
হেমেন্দ্রকুমার রায় ।। প্রেতাত্মার প্রতিশোধ ৮
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ।। হারানো কাকাতুয়া ১০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ।। ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০

পাঁচটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

সমরজিৎ কর ।। পরমাণু প্রসঙ্গ ১৫
জয়ন্ত বসু ।। পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় ১৫
অমরনাথ রায় ।। সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস্ ১০
পার্থসারথি চক্রবর্তী ।। বুদ্ধি নিয়ে খেলা ১০
বিমান বসু ।। নক্ষত্র পরিচয় ১০

এবং দুটি অতি প্রয়োজনীয় বই

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস বুক অফ নলেজ ৫০

অমরনাথ রায় সম্পাদিত

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

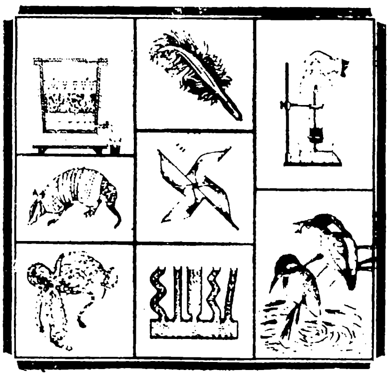

ছোটদের বইয়ের স্বপ্ন রাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

ছোটদের জন্যে কলম ধরেছেন বর্ষীয়ান লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ...

কারণ আজকের দিনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পড়তে হয় অনেক বই। শুধু সিলেবাসের পড়া সম্পূর্ণ করার জন্যই নয়, অজানাকে জানার আগ্রহ ও তাদের খুব। অথচ স্কুলের ছেলেমেয়েদের অসীম কৌতূহল মেটাতে পারে এমন প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুবই অল্প। তাই ছোটদের জন্যে বিশেষতঃ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য একখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সাধারণ জ্ঞানের বই (বুক অব নলেজ) প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যে পরিকল্পনাকে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন কুড়িজন সেরা লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ যাঁদের লেখার সঙ্গে ছোটরা বিশেষভাবে পরিচিত।

বিচিত্র এই পৃথিবী গঠন কেমন, কবে কিভাবে পৃথিবীর বুকে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছিল—সেইসব বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের পর কিভাবে আবির্ভাব হল মানুষের? মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসও বড় রোমাঞ্চকর ইতিহাস। এই পর্যায়ে লিখবেন: **দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু পাত্র, সলিল রাহা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ধীরেন্দ্রলাল ধর ও নারায়ণ সান্যাল।**

শিল্প ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে চলল বিজ্ঞানের জয়রথ। গুহাবাসী মানুষের আগুনের ব্যবহার থেকে শুরু করে আজকের মানুষ এসে পৌঁছেছে ইলেকট্রনিক্স-এর যুগে। শুধু পৃথিবীর বুকেই মানুষ নিজেকে আটকে রাখেনি, পাড়ি জমিয়েছে মহাকাশের বুকে, অভিযান চালিয়েছে সমুদ্রের অতলে। আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছে তার আনন্দের উপকরণও। বিজ্ঞানের গবেষণা ও সাফল্যের আনুপূর্বিক বিবরণ লিখবেন: **ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অমরনাথ রায়, অজয় চক্রবর্তী, বিমান বসু, সমরজিৎ কর, সিদ্ধার্থ ঘোষ, অজয় দাশগুপ্ত, সুবীর দত্ত, সিদ্ধার্থ রায়, অমিত চক্রবর্তী, রজত রায় এবং পার্থসারথি চক্রবর্তী।**

আর কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের এই সুজলা সুফলা পৃথিবীর? এবং আমাদের এই বর্তমান পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ পরিণতিই বা কী—এ নিয়ে লিখবেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার।

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস বুক অব নলেজ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
জুন, 1987

আগামী সংখ্যায়

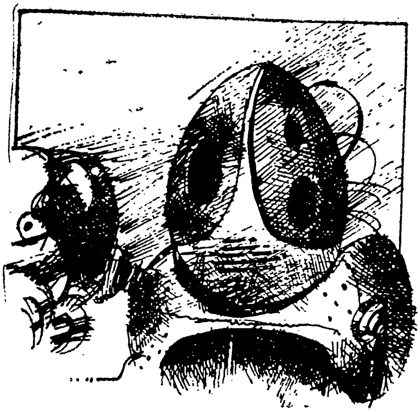

কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যা
বিষয়ে বিশেষ রচনা

লিখবেন
সিদ্ধার্থ রায়
ও আরও অনেকে

প্রধান সম্পাদক ॥ সমরজিৎ কর
সম্পাদক ॥ রবীন বল
সহ সম্পাদক ॥ জয়ন্ত দত্ত

সূচীপত্র

চিঠিপত্র ঃ 4 **কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর** ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ॥ সমরজিৎ কর 7

কল্প বিজ্ঞানের গল্প ঃ কয়েকদিনের অতিথি ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 31

অভিযানের গল্প ঃ কামেট অভিযান ॥ তপনারণ ঘোষ 47

বিশেষ রচনা ঃ মহাকাশে যোগাযোগ ব্যবস্থা ॥ অনাদি নাথ দাঁ 19

পড়াশোনা ঃ পদার্থ বিজ্ঞানের এককাবলী ॥ রমানাথ চক্রবর্তী 15 ঃ ভগ্নাংশের ভাগের মৌখিক কৌশল ॥ শৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী 18 ঃ হিলিয়াম ॥ অমরনাথ রায় 53

জ্ঞান বিজ্ঞানের রচনা ঃ বলতে পারো কার লেখা ॥ রবীন বসু 17 ঃ জ্ঞান বিজ্ঞানের বই ॥ অমরনাথ রায় 54 ঃ ছড়া ॥ কমল চক্রবর্তী 38 ঃ বিজ্ঞানের খবর ॥ বরুণ মজুমদার 66

জীবজন্তু ও গাছপালা ঃ কড়ি ॥ সলিল রাহা 42 ঃ কলাগাছ ॥ মুরারিমোহন ভট্টাচার্য 39

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ বিজ্ঞানীদের টুকিটাকি ॥ অমরনাথ রায় 52 ঃ বর্ণালী ও তার প্রয়োগ ॥ অতীন অধিকারী 51

ব্রহ্মাণ্ডের খবর ঃ নতুন সুপারনোভা ॥ মৃণ্ময়ী দাস 29

শরীর স্বাস্থ্য চিকিৎসা ঃ নাকে রক্ত—খেলাপণ্ড ॥ আশিস দাস 41

ইলেকট্রনিক্স-এর কলা-কৌশল ঃ ইলেকট্রনিকস্-এর কথা ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 27

ধারাবাহিক রচনা ঃ নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 35 ঃ বিজ্ঞানের ডায়েরী—জুন ॥ বিমান বসু 9

আবিষ্কারের গল্প ঃ বাইফোকাল লেন্স ॥অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 58

ছবিতে গল্প ঃ প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 11 ঃ আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার 12 ঃ বায়ুদূষণ পরিমাপে লাইকেন ॥ তারকমোহন দাস এবং সীমা সেন 14 ঃ বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 55 ঃ খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস ॥ গৌতম কর্মকার 43

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের খবর 59 ঃ সফল উত্তরদাতাদের নাম 59 ঃ অটোগ্রাফ সহ গ্রন্থ উপহার 60 ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1 2 3 ॥ 56 ঃ শব্দকূট ॥ রামপ্রসাদ সরদার ॥ 57 ঃ গত সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান 57 ঃ সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ ও ফটো ক্যুইজ কনটেস্টের সমাধান 57 ঃ আই কিউ টেস্ট ও সমাধান 57 ঃ খেলাঘরের ব্যারোমিটার ॥ অপরাজিত বসু 62 ঃ অডিও অ্যামপ্লিফায়ার ॥ শুভাশিস বিশ্বাস 61 ঃ বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 63 ঃ পুরস্কৃত রচনা ঃ পাখি ॥ সুরজিৎ দে 62

ছবি এঁকেছেন ঃ অলয় ঘোষাল, সুবোধ মণ্ডল ও সুশান্ত বিশ্বাস
প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল

চিঠিপত্র

রয়্যাল সোসাইটি ও ভারতীয় এফ্. আর এস.

'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে বেলিয়াতোড় উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁকুড়ার শ্রী-অংশুমান কর-এর প্রশ্ন 'রয়েল সোসাইটি সম্বন্ধে জানতে চাই—ডঃ মেঘনাদ সাহা কত সালে রয়েল সোসাইটির সদস্য হয়েছিলেন ?'—এর উত্তর দিতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে সুধাংশু পাত্র মহাশয় লিখেছেন 'প্রথমের দিকে স্যার আইজাক নিউটনও উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে মনে হয়।'—পৃষ্ঠা 64 [কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, ডিসেম্বর 1986]

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, মাধ্যাকর্ষণ-এর আবিষ্কারক স্যার আইজাক নিউটন [জন্ম 25 ডিসেম্বর 1642, মৃত্যু 20 মার্চ 1727] অবশ্যই রয়েল সোসাইটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি 1702 সাল থেকে আমৃত্যু (1727) উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি [President] পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রয়েল সোসাইটি স্থাপিত হয় 1645 সালে।

পাত্র মহাশয় আরও লিখেছেন—"ভারতের অনেক বিজ্ঞানীই উক্ত সম্মানের [এফ্. আর. এস.] অধিকারী হয়েছেন। প্রথম 1841 সালে বোম্বাইর বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার জাহাঙ্গীর কারসেৎজী উক্ত সম্মান লাভ করেছিলেন।"

প্রথম ভারতীয় এফ. আর. এস. হলেন 'আরদেশীর কারসেৎজী' [Ardeshir Cursetji, জন্ম 6 অক্টোবর 1808, মৃত্যু 16 নভেম্বর 1877], জাহাঙ্গীর কারসেৎজী নয়।

তাছাড়া, পাত্র মহাশয়, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা এফ. আর. এস. হয়েছেন এমন মাত্র 15 জন-এর নাম [কারসেৎজী বাদে] উল্লেখ করেছেন।

যাহ হউক, আজ পর্যন্ত সে সকল ভারতীয় এফ. আর এস. সম্মান লাভ করেছেন, তাঁদের নাম নিচে উল্লেখ করলাম—

ক্রমিক নং	নাম	সন
1	আর্দেশীর কারসেট্জী	1841
2	শ্রীনিবাস রামানুজন্	1918
3	স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু	1920
4	স্যার চন্দ্রশেখর ভেংকট রমন	1924
5	অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা	1927
6	অধ্যাপক জন বার্ডন স্যান্ডারসন হ্যালডেন [তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন]	1932
7	অধ্যাপক বীরবল সাহনী	1693
8	অধ্যাপক কারিমানিক্কম্ শ্রীনিবাস কৃষ্ণণ	1940
9	অধ্যাপক হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা	1941
10	অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাট্নগর	1943
11	অধ্যাপক সুব্রমনিয়ম চন্দ্রশেখর [তিনি বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক]	1944
12	অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ	1945
13	ডঃ দারাশ্ব নাসের ওয়ান ওয়াদিয়া	1957
14	অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু	1958

কাইনেটেফোন আবিষ্কার

আপনার পত্রিকায় "কাইনেটোফোন আবিস্কার" প্রবন্ধে লেখকদ্বয় টেলিফোনের আবিস্কর্তারূপে বর্ণনা করেছেন এডিসন কে। কিন্তু যতদূর জানি টেলিফোন আবিস্কার করেন আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল। একথা বলা যায় যে এডিসন এই যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন যথেষ্ট পরিমানে। আর জিজ্ঞাকে ভোলাতে বলছি এই এডিসন-ই-1877 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আবিস্কৃত ফনোগ্রাফ ও কাইনেটোস্কাপকে এক সাথে জুড়ে মানুষের কথা বা গান অথবা শব্দকে শোনানোর ব্যবস্থা করেন। জিজ্ঞা এতক্ষণে আরও কিছু শুনেছে। তাকে চুপি চুপি জানিয়ে রাখি প্রথম সবাক চলচ্চিত্র হল "Lights of New York"। বাংলায় প্রথম সবাক চলচ্চিত্র হল জামাই ষষ্ঠী। লেখকদ্বয়কে প্রশ্ন এডিসনের "সিনে ম্যাটগ্রাফ" জিনিষ টা কি ? নিবেদনান্তে।

বিদ্যুৎ দত্ত গ্রাঃ + পোঃ—হাট কৃষ্ণনগর বাঁকুড়া

জীবন্ত জীবাশ্ম

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানকে জীবন্ত জীবাশ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কেমনা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান তার সমসাময়িক পত্রিকাগুলির মত বিলুপ্তির পথে না গিয়ে ক্রমবর্ধমান উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। জীবজগতে যে অভিব্যক্তি ঘটছে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান তার একটি কাল্পনিক উদাহরণ। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের এই ক্রমবর্ধমান উন্নতিতে একজন পাঠক হিসেবে আমি খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত। ভবিষ্যতে আশাকরি প্রচ্ছদ আরও সুন্দর হবে এবং পড়াশুনা বিভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যাও বাড়ান হবে।

উজ্জ্বল আচার্য c/o জীবন নন্দ আচার্য, পোঃ দিনহাটা, জেলা কোচবিহার পিন 736136।

15 অধ্যাপক শিশির কুমার মিত্র 1958
16 অধ্যাপক তিরুভেংকট রাজেন্দ্র শেষাদ্রি 1960
17 অধ্যাপক পঞ্চানন মাহেশ্বরী 1965
18 অধ্যাপক কল্যাম্পুডি রাধাকৃষ্ণ রাও 1967
19 অধ্যাপক মাম্বিল্লি কালাথিল গোবিন্দ কুমার মেনন 1970
20 ডঃ মনকোম্বু সাম্বশিবম্ স্বামীনাথন্ 1973
21 ডঃ বি. পি. পাল 1976
22 অধ্যাপক গোপাল সমুদ্রম্ নারায়ণ রামচন্দ্রন্ 1977
23 অধ্যাপক দেবেন্দ্র লাল 1979
24 অধ্যাপক (ডাঃ) অব্‌তার সিং পেইন্‌টাল 1981
25 অধ্যাপক সি. এন্. আর. রাও 1982
26 অধ্যাপক এচ্. চন্দ্রশেখর 1983
27 অধ্যাপক ওবেইদা সিদ্দিকী 1984
28 অধ্যাপক (ডাঃ) ভি. রামালিঙ্গস্বামী 1986
29 অধ্যাপক এম. এস. কৃষ্ণণ

বিশেষভাগে উল্লেখনীয়, এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নাও হতে পারে।

সমীর কুমার সূত্রধর
শিক্ষক, শান্তিধাম কালীবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়।
নিউ কলনি, বঙ্গাইগাঁও 783380 আসাম।

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান এর নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।
- পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা হওয়া প্রয়োজন।
- রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে প্রেরিত রচনাটি অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

প্রসঙ্গ ঃ মশা ও ক্লোরোফিল

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফেব্রুয়ারী, 1987 সংখ্যায় (1) মশা সম্বন্ধে কিছু ভুলের প্রতি ও "প্রশ্নোত্তরে" উপযুক্ত ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ

প্রথমত শ্রী দিলীপ দাসের "খুদে বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে 26 পৃষ্ঠায় একেবারে উপরের দিকে পাশাপাশি চিত্র দুটিতে বলা হয়েছে।

"কিউলেক্স" ম্যালেরিয়ার রোগ বাহক মশা। কিন্তু, আসলে "কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া (গোদ) রোগের জীবানু বহন করে ও সংক্রমণ ঘটায়। এনোফেলিশ স্ত্রী জোতীয় মশা ম্যালেরিয়ার বাহক।

বাংলা দেশে

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার গ্রাহক হবার ঠিকানা

সম্পাদক ঃ বিজ্ঞান বার্তা

পোস্ট বক্স : 554
ফোন ঃ 207987

2। "প্রশ্নোত্তর" 65 পৃষ্ঠায় 6 নং প্রশ্নেছিল লাল শাকে ক্লোরোফিল থাকা সত্ত্বেও লাল কেন? উত্তরে বলা হয়েছে "অবশ্য লাল শাকপাতায় ক্লোরোফিল নামক রঞ্জকটি যে একেবারে থাকে না এমন নয়। আমার জিজ্ঞাসা লাল নটেশাকে কি পরিমাণ ক্লোরোফিল থাকে এবং কিভাবে এর সবুজ রং ঢাকা পড়ে যায়? এর উপযুক্ত ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাই। এই সংক্রান্ত বিষয়ে আরও কিছু জানাবার থাকলে তাও জানালে বিশেষ বাধিত হব।

সুরজিৎ ব্যানার্জী 6/3, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া—1

ইউক্লিডের জ্যামিতি ভুল নয়

'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' মার্চ সংখ্যায় 'ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রসঙ্গে, লেখায় ইন্দ্রনীল ঘোষ উপপাদ্যটিকে ভুল বলে ধারণা করেছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করি যে লেখকের চিন্তাধারা সত্যিই উন্নত, কিন্তু একটা ব্যাপারে খেয়াল না থাকায় তার কাছে জ্যামিতিটা ভুল মনে হচ্ছে, তাকে বলি যে, আসলে জ্যামিতিটা ঠিকই আছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

প্রথমেই একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি যাতে ব্যাপারটা সহজে বোঝা যায়। ধর, A এবং B দুটি ছেলে। এদের দুজনের কাছে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে টাকার পরিমাণ নিম্নরূপ—

		A	B	
(1)	জানুয়ারী→	15/-	10/-	→এখানে $15>10$...... (i)
(2)	ফেব্রুয়ারী→	10/-	5/-	→এখানে $10>5$........(ii)

তাহলে দেখ যে, $15-10>10-5$ অর্থাৎ, $5>5$... (iii) এটা কখনও সত্যি নয়। কিন্তু, (i) ও (ii) সবসময়ের জন্যই সত্যি। অর্থাৎ, A এবং B-এর টাকার মধ্যে A-এর টাকা, B-এর টাকা থেকে সবসময়ই বেশি, কিন্তু এটা এমন পরিমাণে বেশি থাকে, যাতে A এবং B-এর টাকার অন্তরের সাংখ্যমান সবসময় সমান থাকে।

অর্থাৎ, দুটো জিনিসের মধ্যে একটা অপরের থেকে সবসময় বেশি হতে পারে, কিন্তু তাদের অন্তরের সাংখ্যমান সবসময় সমান হতেও পারে। এই ব্যাপারটিতে খেয়াল না থাকার জন্য জ্যামিতিটা ভুল মনে হয়েছে। এবার আসল জ্যামিতিটায় আসা যাক।

ছবিটা কল্পনা কর। এই ছবিটায় ইন্দ্রনীল ঘোষের ধারণা অনুযায়ী, $\triangle BAD$-তে, $\angle BDO>\angle BAD$ এবং $\triangle CAD$-তে, $\triangle CDO>\angle CAD$ এবং $\angle BDO-\angle CDO>B\angle AD-\angle CAD$ অর্থাৎ, $\angle BDC>\angle BAC$.

কিন্তু, এখানে ($<BDO\angle CDO$) ও ($\angle BAD-\angle CAD$)—এই দুটি অন্তরের সাংখ্যমানের কথা চিন্তা না করার জন্যই $\angle BDC$ কে $\angle BAC$-র থেকে বড়ো মনে হচ্ছে।

চিত্র অনুযায়ী, $<BAC=\frac{1}{2}BO_1C=<BDC$ । $O_1\equiv$ কেন্দ্র।

ধর, $\angle BAC=\angle BDC=X$, $\angle CDO=Z$ এবং $\angle CAD=Y$

এবার, ইন্দ্রনীল ঘোষের সিদ্ধান্তগুলোতে এই মানগুলো বসিয়ে দেখ, $X+Z>X+Y$ ......(1) এবং

$Z>Y$ ....(2)

তাহলে, (1) থেকে (2) বিয়োগ করে হয়,

$X+Z-Z>X+Y-Y$ অর্থাৎ, $X>X$ এটা কখনই সত্যি না। অর্থাৎ, $\angle BDC=\angle BAC$ এবং এদের পরিমাণ সমান। চিত্র যেভাবেই আঁক না কেন, গৃহীত কোণগুলির মান এমন থাকে যাতে ($\angle BDO-\angle CDO$) ও ($\angle BAD-\angle CAD$)—এই দুটি অন্তরের মান সবসময়ই সমান হবে ও $\angle BDC=\angle BAC$ হবে।

তাহলে বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই যে, অন্তরফল যখনই পাবে, তখনই তার সাংখ্যমান বিবেচনা করতে হবে। তাহলে আর কোনো সংশয় থাকবে না। এবার ইউক্লিডের জ্যামিতিটাকে ভুল বলবে না নিশ্চয়ই।

দুর্জয়কুমার রায়, রেল কোয়ার্টার নং—685/ডি, ও. টি. পাড়া, কাটিহার-854105।

এ সম্পর্কে আরও চিঠি লিখেছেনঃ

শঙ্খশুভ্র নাগ, বিধাননগর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়। কৃতিমান কৃত ও অন্যান্য হেয়ার স্কুল। বির্জন মজুমদার, তালবাগিচা মেদিনীপুর। সন্দীপ ঘোষ, হার্ণেট হাই স্কুল কাঁচড়াপাড়া। দিগন্ত ভট্টাচার্য, হাওড়া হিলা স্কুল। কৌশিক ঘোষ, বেলঘরিরা। তীর্থঙ্কর ঘোষ, হিন্দুস্থান কেবলস্ রূপনারায়ণপুর। ভাগ্যধর মণ্ডল, পাধুলডাঙা হাইস্কুল নদীয়া। তুলি মুখার্জী, কল 36। মৌসুমী রায়, বালুরঘাট। রণজিৎ কুণ্ডু বাঁকুড়া। অর্ঘ্য মজুনদার, নদীয়া। প্রশান্ত সামন্ত, মেদিনীপুর। বাদল দত্ত, নদীয়া। ভাস্কর বসু, হাওড়া জিলা স্কুল।

এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে আর কোন চিঠি প্রকাশিত হবে না। —সম্পাদক

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

সমরজিৎ কর

আশা করি 5ই জুন তারিখটি তোমরা মনে রেখেছ। হয়ত এ কথাও তোমাদের মনে আছে, 1972 সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে স্টকহোমে বসেছিল বিরাট একটি সম্মেলন। পৃথিবীর পরিবেশ দূষণ-মুক্ত রাখার জন্যে সবাই যাতে চেষ্টা করে, এই সম্মেলনে সেটাই ঠিক হয়েছিল। সম্মেলনে নতুন একটি সংস্থাও তৈরি হয়। যার নাম ইউনাইটেড নেশনস এনভাইরনমেনটাল প্রোটেকশন বা সংক্ষেপে 'ইউ. এন. ই. পি.'। যার বাংলা করলে দাঁড়ায় বিশ্বপরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা। 1972 সালে এই সংস্থাটি ঠিক করে প্রতি বছর 5 জুন তারিখটি পৃথিবীর সমস্ত দেশ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে পালন করবে। পরিবেশ সংক্রান্ত এক-একটি বিষয় নিয়ে বড়দের মত স্কুলের ছেলে-মেয়েরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। পরিবেশ যাতে দূষণ-মুক্ত থাকে তার জন্যেই কিছু কিছু কাজ করবে।

তা সমস্যাও কি কম? চাষবাসের কথাই ধরো না। 1947 সালের 15 আগস্ট ভারত যখন স্বাধীন হল তখন এ দেশে জনসংখ্যা ছিল 35 কোটি। এখন এসে দাঁড়িয়েছে 72 কোটিতে। এত মানুষের খাবার তো চাই। অতএব চাষবাস বাড়াও। চাষের জমি বাড়াতে গিয়ে বনের পর বন কেটে পরিষ্কার করা হল। বনে পশুপাখি বাস করে। বন কমে যাওয়ায় তাদের সংখ্যা কমে গেছে। পাখি কীট-পতঙ্গ ধরে খায়। আমরা ছোট বয়েসে দেখতাম, বর্ষার আগে পাখনা মেলে এক জাতের পিঁপড়ে উড়ত ঝাঁকে ঝাঁকে বিশেষ করে বিকেল এবং সন্ধ্যার দিকে। আর তখন চামচিকের দল এসে তাদের খেয়ে ফেলত। কমত পিঁপড়ের দৌরাত্ম। এখন বন কমে গেছে, চামচিকেও কমছে। পোকার বেড়েছে বাড়। বন কেটে ফেলায় বহু জায়গায় জমি হয়েছে আলগা। একটু বাতাস বইলেই ওঠে ধূলি-ঝড়। বাতাসে বেড়েছে ধূলি কণা। ধূলি কণার সঙ্গে মিশে থাকে নানা রকম জীবাণু আর ভাইরাস। এরা প্রশ্বাসের সময় আমাদের শরীরে ঢুকে হাঁপানি থেকে শুরু করে কত রকমের রোগই না ঘটায়।

বলছিলাম চাষের জমি বাড়ানো হয়েছে। ফসল বাড়াতে গেলে দরকার প্রচুর সার। নাইট্রেন সার বিশেষ করে। নাইট্রোজেন সূর্যের আলোর স্পর্শে বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে নাইট্রোজেনের অক্সাইড। এই অক্সাইড বাতাসে মিশে থাকা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রাস এবং নাইট্রিক অ্যাসিড। যারা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, ধাতব সাজ-সরঞ্জামেরও ক্ষতি করে। ঊর্ধ্বাকাশে উঠে নাইট্রোজেনের অক্সাইড ওজন স্তরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এর ফলে ওজন স্তর হাল্কা হয়। সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনী রশ্মি হাল্কা ওজন স্তরে শোষিত হয় কম। তাই ভূপৃষ্ঠে বিপজ্জনক এই রশ্মির মাত্রা বাড়ে। অতিবেগুনী রশ্মি প্রাণী এবং উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর। এই রশ্মির মাত্রা বাড়লে ক্যানসারও হতে পারে। এ ছাড়া বর্ষার সময় অতিরিক্ত সার ধোয়ানির সঙ্গে মিশে পুকুর, নদী-নালায় গিয়ে পড়ে, তাতে জলজগাছের হয় বাড়বাড়ন্ত। অতিরিক্ত উদ্ভিদ জন্মালে জলে অক্সিজেন কমে। মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতি হয়।

পথে বাস-ট্রামের তীক্ষ্ণ বাঁশী। কলকারখানায় কানে তালা লাগান, তাও খারাপ। অতিরিক্ত শব্দ রোগ সৃষ্টি করতে পারে, রক্তচাপ বাড়াতে পারে, শোনার ক্ষমতা কমায়, স্মৃতি-শক্তি কমায়, ঘুম নষ্ট করে।

অরণ্যের কথা বলছি। অরণ্য কমে যাওয়ায় ভারতের মত বহু দেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কোথাও বেড়েছে শীত, কোথাও গরম। কাঠ, কয়লা, তেল জ্বালানোর দরুন বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়েছে। ফলে আবহাওয়ার তাপমাত্রাও বেড়েছে, এতে করেও আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়।

বিভিন্ন দেশে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য বসান হয়েছে পারমাণবিক চুল্লি। এই সব চুল্লি থেকে ছড়ায় তেজস্ক্রিয় বস্তু কণা। মাঝে মাঝে ঘটান হচ্ছে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। এর ফলেও ছড়ায় তেজস্ক্রিয় বস্তু কণা।

এ সব ছাড়াও রয়েছে আরো কত সমস্যা। তোমাদের বাড়ি এবং আশেপাশের ব্যাপার দেখ। জল নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। নালা-নর্দমার জল জমে নানান রোগের জীবাণু। সে সব জীবাণু থেকে হচ্ছে কত রকম রোগ। ভারতে শতকরা 30টি শিশু বছর দুই বয়েসে না পৌঁছতেই পেটের রোগে মারা যায়। নালা-নর্দমা এবং পচা পুকুরে বাড়ছে মশা। মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে। বছর চল্লিশ

K. J. B./June 87/2

আগেও এ দেশে মহামারীরূপে দেখা দিত ম্যালেরিয়া। ডি ডি টি ছড়িয়ে মশার বংশ ধ্বংস করার ফলে এ রোগ কমে যায়। এখন দেখা দিচ্ছে নতুন জাতের মশা। এদের অনেকে ডি ডি টি'র স্পর্শেও বেঁচে থাকে। পচা পুকুর, স্যানিটারি পায়খানার চেম্বার প্রভৃতিতে তারা বংশ বৃদ্ধি করে। করছেও বিপুল ভাবে। তাই আবার বেড়েছে ম্যালেরিয়া। কোন কোন জায়গায় ম্যালেরিয়া এখন মহামারী। এ ছাড়া আন্ত্রিক রোগের কথা প্রায়ই তো কাগজে পড়ে থাক। এ রোগও জলের মাধ্যমে ছড়ায়। গরম পড়লেই রোগের প্রাদুর্ভাবও বাড়ে।

মাঝে গিয়েছিলাম হুগলী জেলার একটি গ্রামে। গ্রামটির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দামোদর নদী। বৈশাখে নদীতে জল থাকে কম। গ্রামের পাশে শুকনো জমি। একজন গ্রামবাসী বললো, এখন তো জমি শুকনো দেখছেন, বর্ষায় আসুন দেখবেন সবটাই সমুদ্র। প্রবল বর্ষণের সময় এ অঞ্চল বন্যার জলে ডুবে যায়। ভেসে যায় ঘরবাড়ি, মানুষ এবং পশু। শুনলাম আগে নাকি এমন হত না। অতিরিক্ত মাটি কর্ষণে জমির মাটি হয়েছে আলগা। বর্ষার জলে সেই মাটি ধুয়ে গিয়ে পড়ে নদী-নালায়। নদী-নালা মজিয়ে দেয়। বর্ষার জল নদী নালা পথে ঠিকমত প্রবাহিত হতে পারে না। উপচে পড়ে সৃষ্টি করে বন্যা।

5 জুনে এ সবই তো আলোচনার বিষয়। এই আলোচনা পরিবেশ-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বুঝে উঠতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও এই দিনটি উপলক্ষ্য করে তোমরাও কিছু কিছু কাজ করতে পারো। নিজেদের বাড়ির আশেপাশের নালা-নর্দমা সবাই মিলে পরিষ্কার করতে পারো। পুকুর ডোবার পানা পরিষ্কার করতে পারো। জঞ্জাল পরিষ্কারেও হাত দেওয়া যায়। দলবদ্ধভাবে পথ চলতি বাস-ট্রাক আটকে তাদের চালকদের তীক্ষ্ণ বাঁশি বাজাতে বাধা দিতে পারো। নিজেদের ফাঁকা জমি অথবা পথের ধারে বৃক্ষ রোপণও করা যায়। রোপণ করা গাছ যাতে না নষ্ট হয়, যাতে কেউ না কাটে সে দিকে নজর রাখতে পার। কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের যারা সদস্য-সদস্যা বা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পাঠক-পাঠিকা তাদের সকলের কাছে এ ধরনের কাজ আমরা বিশেষ ভাবে আশা করি। এ সব করলে তবেই বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন সার্থক হবে।

আমরা কাজে নেমেছি অন্ধকার ঘুচিয়ে
মানুষের জীবনে আলো পৌঁছে দিতে

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেকদিন ধরে বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য অনেক অসুবিধে ভোগ করেছেন। তবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই আজ সেই সংকটকে আমরা প্রায় অতিক্রম করতে পেরেছি, দীর্ঘ পথের শেষে যেন আজ আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের সামনে এখন নতুন কাজ, নতুন দায়িত্ব, কেবল আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করাই নয় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থার মান আরও উন্নত করতে হবে, যাতে নিয়মিত, সুষ্ঠুভাবে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়। বিদ্যুৎ চুরি ও অন্যান্য দুর্নীতি রোধ করতেই হবে।

প্রগতি ও পরিবর্তনের শুভকর্ম পথে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সংকল্পবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ।

বিজ্ঞানের ডায়েরী, জুন

বিমান বসু

7 জুন, 1979 ভারতে তৈরি দ্বিতীয় উপগ্রহ 'ভাস্কর-1 কে এই দিন সোভিয়েত রাশিয়ার এক মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে মহাকাশে পাঠানো হয়। 444-কিলোগ্রাম ওজনের উপগ্রহটিকে ভূপৃষ্ঠ

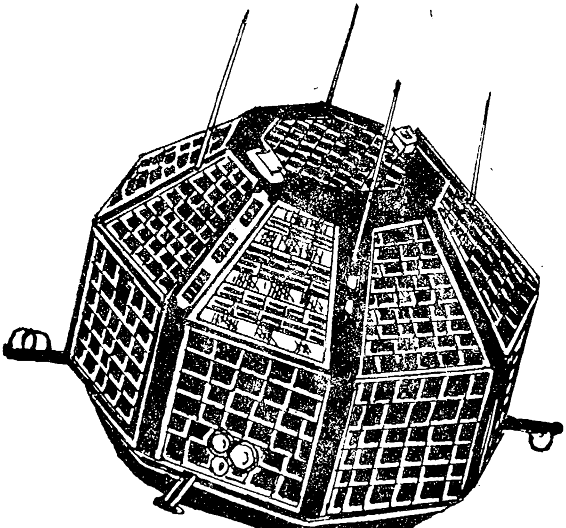

ভাস্কর

থেকে 525 কিলোমিটার ওপরে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। উপগ্রহটিতে অন্যান্য যন্ত্রপাতি ছাড়া একটি টিভি ক্যামেরাও ছিল যা থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের বহু ছবি তোলা হয়েছিল। মহাকাশে দু'বছর থাকার পর 1981 সালের 1 আগস্ট উপগ্রহটি অকেজো হয়ে পড়ে।

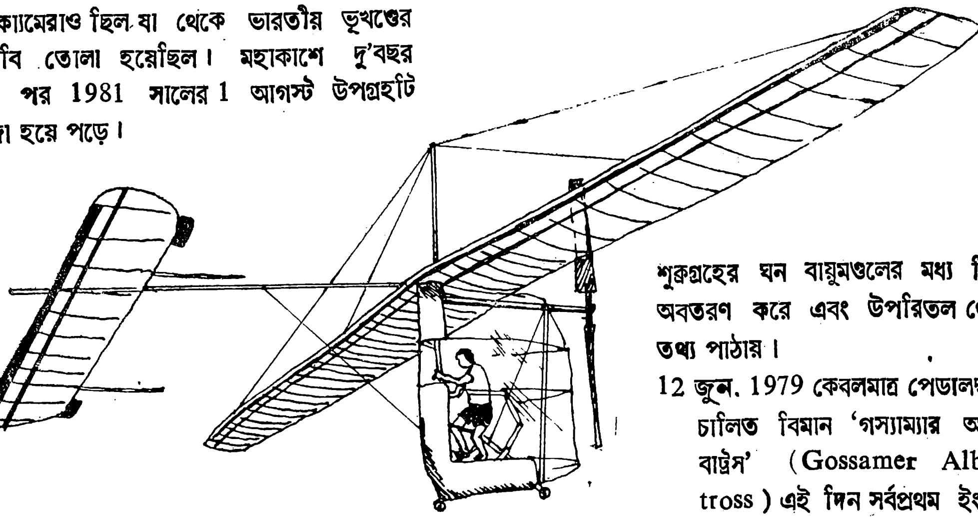

গস্যামার অ্যালবাট্রস

9 জুন, 1781 বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিনের আবিষ্কারক জর্জ স্টিফেনসন (George Stephenson) এই দিন ইংল্যাণ্ডের নিউক্যাসল্ অন্ টাইন (Newcastle on Tyne) এর কাছে এক ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা এক কয়লাখনিতে কাজ করতেন। ছোটবেলা থেকেই জর্জ তার বাবাকে খনির বাষ্পচালিত পাম্প মেরামত ইত্যাদি কাজে সাহায্য করতেন। 1841 সালে জর্জের তৈরি ইঞ্জিন সর্বপ্রথম কয়লা বহন করার কাজে লাগানো হয়। ঐ ইঞ্জিন দিয়ে 30 টন কয়লা 13 কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত অনায়াসে টানা যেত। 1825 সালের 27 সেপ্টেম্বর জর্জের তৈরি রেল ইঞ্জিন 'লোকোমোশান' (Locomotion) দিয়ে বিশ্বের-সর্বপ্রথম সার্বজনীন রেলপথে গাড়ি টানা হয়। উত্তরপূর্ব ইংল্যাণ্ডের ডার্লিংটন Darlington ও স্টকটন (Stoekton) এর মধ্যে 16 কিলোমিটার লম্বা রেলপথে 38টি খোলা ডিববাওয়ালা যে গাড়ি চালানো হয় তাতে মাল ছাড়াও 450 জন যাত্রি ছিল। 1829 সালে জর্জ ও তাঁর পুত্র রবার্ট (Robert Stephenson) এর তৈরি ইঞ্জিন 'রকেট' ঘণ্টায় 48 কিলোমিটার বেগে ট্রেন চালিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল।

12 জুন, 1967 এই দিন সোভিয়েত গ্রহযান 'ভেনেরা-4' (Venera-4) কে শুক্রগ্রহ অভিমুখে পাঠানো হয়। প্রায় চার মাস পর 18 অক্টোবর গ্রহযানটি সর্বপ্রথম শুক্রগ্রহের ঘন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে অবতরণ করে এবং উপরিতল থেকে তথ্য পাঠায়।

12 জুন. 1979 কেবলমাত্র পেডালদ্বারা চালিত বিমান 'গস্যাম্যার অ্যালবাট্রস' (Gossamer Albartross) এই দিন সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার করার গৌরব অর্জন করে। 26 বছর বয়স্ক তরুণ ব্রায়ান অ্যালেন (Bryan Allen) এক নাগাড়ে 2 ঘণ্টা 49 মিনিট পেডাল চালিয়ে 28

কিলোগ্রাম ওজনের ঐ বিশেষ বিমানটিকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে 37 কিলোমিটার পথ উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে। এই কৃতিত্বের জন্য তাকে এক লক্ষ পাউণ্ড পুরষ্কার দেওয়া হয়।

13 জুন, 1831 এই দিন বিখ্যাত পদার্থবিদ ও তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের (Electromagnetic Theory) প্রবর্তক জেম্স্ ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েল (James clerk Maxwell) এর জন্ম হয়। ম্যাক্স্ওয়েলই সর্ব প্রথম প্রমাণ করেন যে আলোও এক ধরনের বিদ্যুৎ-

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

চুম্বকীয় তরঙ্গ, তার রং নির্ভর করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর। বিজ্ঞানে তাঁর আর একটি বিশিষ্ট অবদান হলো গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব বা Kinetic Theory of gases। এছাড়া ম্যাক্স্ওয়েলই সর্বপ্রথম শনি-গ্রহের বলয়ের গঠন সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দেন। 1859 সালে প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে তিনি বলেন যে ঐ বলয় চাকতির মত কঠিন নয়, বরং অসংখ্য ছোট ছোট বস্তু পিণ্ডের সমাবেশ, ঠিক যেমনটি আজ আমরা জানতে পেরেছি।

12 জুন, 1983 মানব রহিত গ্রহযান 'পাইওনিয়ার-10' (Pioneer-10) এই দিন আমাদের সৌরমণ্ডলের

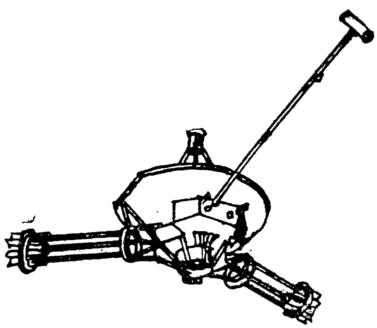

পাইওনীয়ার-10

সীমা অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। গ্রহযানটিকে পৃথিবী থেকে ছাড়া হয়েছিল 3 মার্চ 1972 তারিখে। 1973 সালের 4 ডিসেম্বর গ্রহযানটি বৃহস্পতি গ্রহের কাছে গিয়ে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে বৃহস্পতি ও তার তিনটি বড় উপগ্রহ—ইউরোপা, গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টো'র রঙীন ছবি তুলে পাঠায়।

16 জুন, 1963 এই দিন বিশ্বের প্রথম মহিলা মহাকাশ যাত্রি 26-বছর বয়স্কা ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা (Valentina Tereskova) সোভিয়েত 'ভস্তক-6' যানে চড়ে মহাকাশ যাত্রা শুরু করেন। পৃথিবী 48 বার পরিক্রমার পর তিনি আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসেন।

19 জুন, 1981 ভারতে তৈরি প্রথম দূরসঞ্চার উপগ্রহ 'অ্যাপ্‌ল্' (APPLE) কে এই দিন ইউরোপীয় স্পেস্ এজেন্সির 'অ্যারিয়ান' (Ariane) রকেট দ্বারা ফরাসী গায়ানার কোরু (Kourou) থেকে

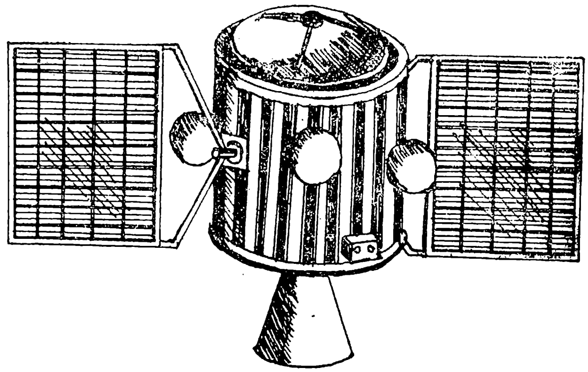

অ্যাপ্‌ল

মহাকাশে ছাড়া হয়। 120 কিলোমিটার লম্বা ও 120 সে. মি ব্যাসের বেলনাকার উপগ্রহটিতে টিভি অনুষ্ঠান রিলে করার জন্য বিশেষ ট্রান্সপন্ডার ছিল যা দিয়ে দেশব্যাপী টিভি প্রচার ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা হয়। উৎক্ষেপণের পর 16 জুলাই তারিখে অ্যাপ্‌ল্‌কে বিষুব রেখার 36.000 কি. মি ওপরে 102° পূর্ব দ্রাঘিমায় ভূসমলয় কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

28 জুন, 1972 প্রখ্যাত সংখ্যায়নবিদ্ অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ এই দিন পরলোক গমন করেন।

29 জুন, 1893 অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের জন্ম। প্রথম জীবনে পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেন। 1915 সালে কেমব্রিজ থেকে ম্যাথেমেটিক্যাল ট্রাইপস ও ন্যাশন্যাল সায়েন্স ট্রাইপস করার পর দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। পরিসংখ্যান নিয়ে তাঁর মহত্বপূর্ণ কাজের জন্য ভারত সরকার 1955 সালে অধ্যাপক মহলানবীশকে দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করতে আমন্ত্রণ করে। 1932 সালে অধ্যাপক মহলানবীশেরই প্রচেষ্টায় ভারতীয় সংখ্যায়ন প্রতিষ্ঠান বা Indian Statistical Institute' এর স্থাপন হয়।

7 UF কলেজ রোড, নিউদিল্লী—1

প্রাণী বিচিত্রা

শৈল চক্রবর্তী

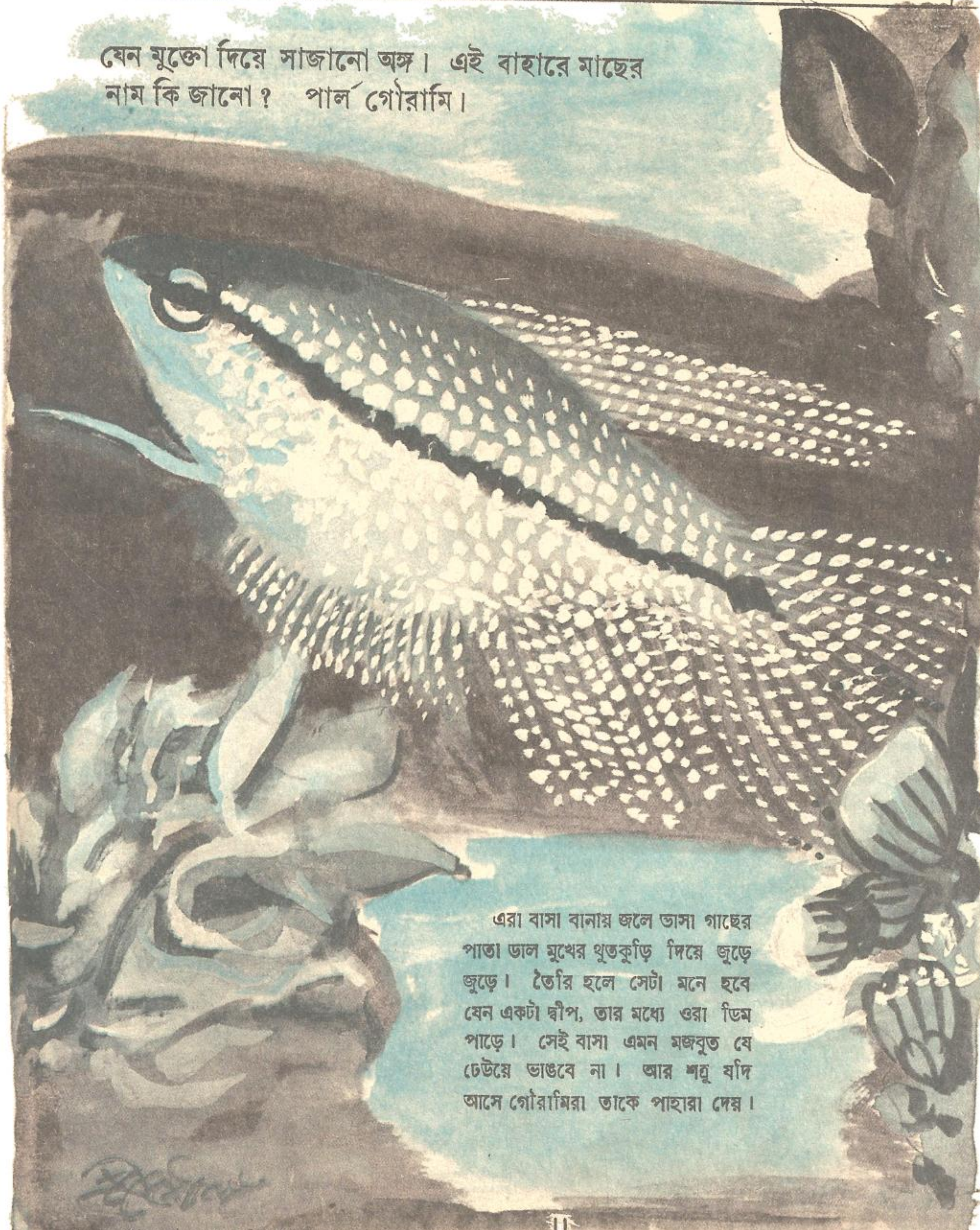

KJB/JUNE/87/1,3

আবিষ্কারক কলম্বাস

রূপায়ণ : অনিল কর্মকার / চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

নাবিক হবার একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে আপন অবসরের সময়গুলি ভূগোল বই নিয়ে মেতে গেল ক্রিস্টোফার। রাতের আকাশে ধ্রুবতারা আর সপ্তর্ষিমণ্ডল, শুকতারা আর কালপুরুষের দিকে চেয়ে মন পাড়ি দিল অজানা সমুদ্রে। আকাশের ঐ গ্রহনক্ষত্রই নাবিকদের সঠিক পথে চালিত করে। ওরাই নীরব উপস্থিতিতে জানিয়ে দেয় জাহাজের অবস্থান। অতএব জ্যোতির্বিদ্যার বই নিয়ে ক্রিস্টোফার ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিল। দিনের পর দিন। কিন্তু তারপর ?

সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমাতে হলে তার নাড়ী-নক্ষত্র জানতে হবে। বাতাসের গতি, উপসাগরীয় স্রোত, জাহাজ চালনার কৌশল, নাবিকদের পরিচালিত করবার ক্ষমতা—তার জন্যে চাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। সমুদ্রের বুকে সত্যিকারের কোনও নৌকায় চড়ে পাড়ি জমানো। একবার নয়, বারবার।

সুযোগ এলেই তাই বেরিয়ে পড়ে ক্রিস্টোফার। একদিন তেমনি ভাবেই সমুদ্রে চলেছে, হঠাৎ মেঘ দেখা দিল আকাশের কোণায়। খানিক পরেই উঠলো ঝড়। ক্যাপ্টেন হুকুম দিয়ে বললেন—পাল নামাও। পালের বুকে বাতাস নিয়ে যে জাহাজটি অনুকূলে চলেছিল, ঝড়ের প্রতিকূলতায় তা টলমল করতে লাগলো। কী বিরাট একটা ঢেউ! অনেক দূরে জেনেভার অস্পষ্ট নগরসীমা তখনো দেখা যায়।

জাহাজটাকে আয়ত্তে রাখবার জন্যে প্রাণপণে নাবিকরা দাঁড় টানছে। যাতে উপকূল থেকে কিছুতেই ওটা বাইরে সরে যেতে না পারে। কারণ বারসমুদ্রে একবার পড়লে বাঁচবার আশাও কারও থাকবে না।

অনেক রাতে যখন ঝড় ধীরে ধীরে থেমে গেল, আকাশে কাস্তের মতো চাঁদ, সমুদ্রের স্রোত যেন নাচতে নাচতে ছুটে এসে জাহাজটিকে আলিঙ্গন করছে, তাকে সোহাগ জানাচ্ছে। তখন বিহ্বল হয়ে ঐ আকাশ, ঐ চক্রসীমা—সবকিছুর মধ্যে তন্ময় হয়ে ক্রিস্টোফার ভাবলো—নাবিক তাকে হতেই হবে। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মহানাবিক।

বইয়ের পর বই সংগ্রহ করে ক্রিস্টোফার পড়ে যেতে লাগলো। বৈদিক বিশ্বের রূপ তাকে রূপকথার জগতের সন্ধান দিল। আমাদের এই পৃথিবী এক সুবিশাল থালার মতো বিস্তীর্ণ। মাথার উপর স্বর্গ। সেখানে ঘুরে বেড়ায় যতো নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য। মাঝখানে অন্তরীক্ষ। সেখানে বিচরণ করে পাখিরা, মেঘ এবং অর্ধদেবতাদের দল। হিন্দু-ধর্মের মতে ব্রহ্মাণ্ডের স্তর 21টি। উপর থেকে গুণলে তার সপ্তম স্তরে পৃথিবী, ছয়টি স্বর্গের নিচে। আর পৃথিবীর নিচে পাতাল,—সপ্ত পাতাল আর সপ্ত নরক। অন্যান্য অনেক বিশ্ব থেকে এই ব্রহ্মাণ্ড অনেক দূরে মহাশূন্যে ঝুলছে।

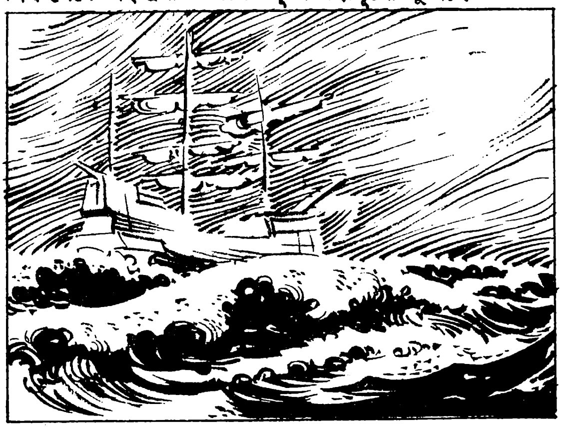

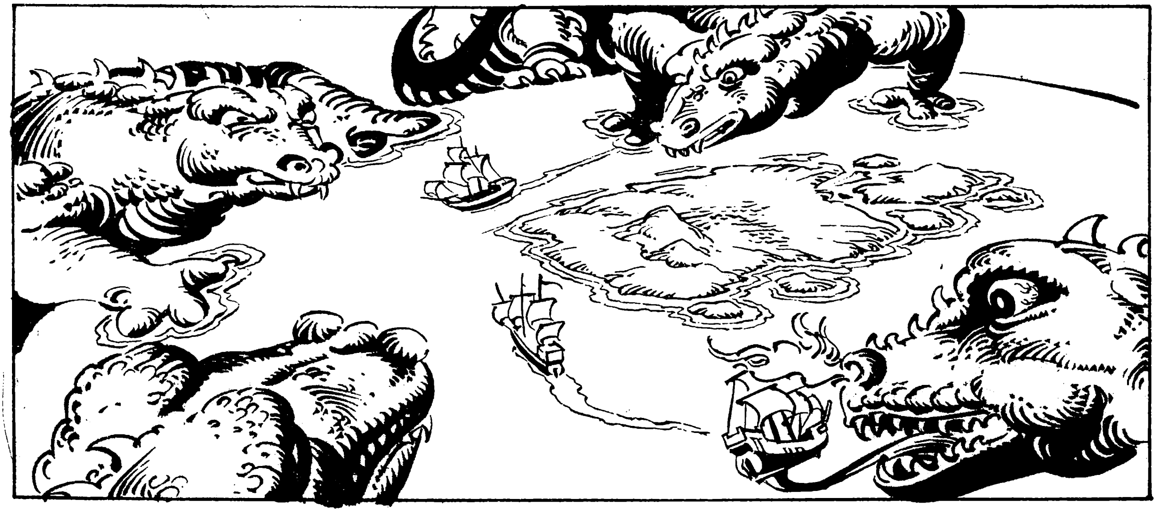

কবি হোমারও পৃথিবীকে থালার মতো বলেই বর্ণনা করেছেন। তাকে বেষ্টন করে আছে একটি নদী—ওশিয়েনাস। উপরে ঢাকনার মতো ঘিরে আছে বিশাল আকাশ।

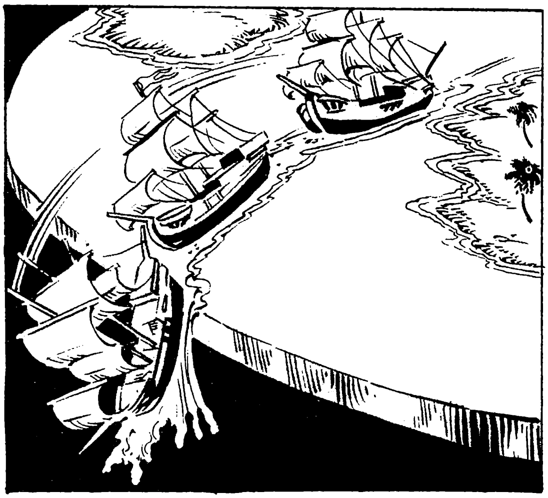

সে-যুগের ইউরোপে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল হোমারেরই ধারণার কাছাকাছি। তারা বিশ্বাস করতো—পৃথিবী ঠিক থালার মতো চ্যাপ্টা। আর তাকে ঘিরে রেখেছে সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রাণী।

বর্তমান তুরস্কের মাইলিটাস শহরে বাস করতেন এক গ্রীসীয় দার্শনিক—অ্যালাকসিম্যাণ্ডার। তিনি বলেছেন—পৃথিবী এক বাতাস-পরিবৃত থামের মতো। বিশ্বের কেন্দ্রে তা সোজা হয়ে ভাসছে। বায়ুমণ্ডলের উপরে এক আগুনভরা চাকা আছে। তার ফুটো দিয়ে যে তেজ পৃথিবীতে আসছে, তারই নাম সূর্য।

ক্রমে ক্রমে ক্রিস্টোফার জানতে পারলেন—পৃথিবী গোলাকার। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রায় ৬০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে এই কল্পনা করেছেন মাইলিটাস গোষ্ঠীরই একজন বিজ্ঞানী। নাম—থেলিজ।

কেউ কেউ কিন্তু মনে করেন—পিথাগোরাসই প্রথম পৃথিবীর গোলকরূপের কল্পনা করেন। তাঁরই শিষ্যরা প্রচার করে গেছেন—পৃথিবী স্থির নয়, মহাকাশে গতিশীল।

ক্রিস্টোফারের মনে হোল—পৃথিবী যখন বলের মতো গোল, তাহলে নির্দিষ্ট কোনও দিক লক্ষ্য করে চলতে থাকলে যাত্রার শেষে আবার সেই পথেই ফিরে আসা সম্ভব। কিন্তু প্রমাণ করে না দেখাতে পারলে কে মানবে? একটা কাল্পনিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কে বা কারা অকূলে পাড়ি জমাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, যেখানে সামান্যতম কোনও পুরস্কারের আশা পর্যন্ত নেই?

বায়ুদূষণ পরিমাপে লাইকেন

গাছের ছালের ওপর অনেক সময় একরকম সাদাটে ছোপ ছোপ দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এদের বলা হয় লাইকেন (Lichen)। এরা বড় বিচিত্র ধরনের উদ্ভিদ, ছত্রাকের সঙ্গে শ্যাওলার সহঅবস্থানে গড়ে ওঠে ওদের জীবন। কয়েকটি প্রজাতির ছত্রাক নির্দিষ্ট কতকগুলি শ্যাওলার ওপর বসবাস করে। সবুজ শ্যাওলা সূর্যের আলোয় খাদ্য তৈরি করে ছত্রাককে যোগায়, আর ছত্রাক শ্যাওলাকে যোগায় জল ও খাদ্যের উপাদান—ঠিক যেন হোস্ট ও পেয়িং গেস্টের সম্পর্ক। উদ্ভিদকুলে লাইকেনের এই সুন্দর সম্পর্কযুক্ত সহবাস সত্যিই বিস্ময়কর।

শুষ্ক প্রাণহীন পর্বতের ওপর এই লাইকেনরাই বয়ে নিয়ে যায় জীবনের প্রথম চিহ্ন। সামান্য বৃষ্টির জল বা বরফগলা জল পেলেই লাইকেনের স্পোর অঙ্কুরিত হয়। রুক্ষ পাথরের চেহারা ধীরে ধীরে তারা পাল্টে দেয়, সম্ভব করে তোলে অন্য উদ্ভিদের আগমন। নিজেদের দেহাবশেষ ও সূক্ষ্ম ধূলিকণার মিশ্রণে মৃত্তিকা স্তরের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে বিশাল অরণ্য মাথা তুলে ওঠে, যেখানে একদিন প্রাণের চিহ্নমাত্র ছিল না। এক বিশাল অরণ্য সৃষ্টির পেছনে অনেক সময়ই গোপন থাকে একটি লাইকেনের নিষ্ঠুর জীবন সংগ্রাম ও তার আত্মত্যাগের কাহিনী। হিমালয়ের বিশাল নিবিড় অরণ্য যা ভারতের আজ শ্রেষ্ঠ সম্পদ—লক্ষ লক্ষ বছর আগে তার সূচনা হয়েছিল এইভাবেই।

বর্তমানে লাইকেনকে বায়ুদূষণ পরিমাপের কাজে লাগানো হচ্ছে। এরা আসলে খুব সংবেদনশীল প্রজাতির উদ্ভিদ। খুব দূষিত পরিবেশে এদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অপেক্ষাকৃত কম দূষিত পরিবেশে গাছের ছালের ওপর এদের দেখতে পাওয়া যায়। যে কোন রাস্তার ধারের গাছে লাইকেনের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বলা যেতে পারে সেই জায়গার বাতাস কতটা দূষণগ্রস্ত। তবে যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস পরীক্ষা করলে যে রকম বিভিন্ন রকম ক্ষতিকারক পদার্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ বলে দেওয়া যায় লাইকেনের সাহায্যে তা সম্ভব নয়। লাইকেনের সাহায্যে বলা সম্ভব বাতাস অতি নির্মল বা অল্প দূষিত বা ভীষণভাবে দূষিত কিনা। অতি নির্মল বাতাসে যে সব প্রজাতির লাইকেন দেখা যায়, অল্প দূষিত বাতাসে তারা জন্মায় না। আর অল্প দূষিত বাতাসে যে সব প্রজাতির লাইকেন দেখা যায় অতি দূষিত বাতাসে তাদের দেখা যায় না। অবশ্য অতি দূষিত বাতাসে কোনো লাইকেনই জন্মায় না। কলকাতা শহরে আমরা দেখেছি রেড রোড, বি-বা-দি বাগে, আচার্য জগদীশচন্দ্র রোডে, এবং মিণ্টো পার্কের মধ্যে কোনো লাইকেন নেই, কিন্তু বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের বাগানে, গল্ফগ্রীনে, বালিগঞ্জ লেকের ধারে ও বোটানিকাল গার্ডেনের কেন্দ্রস্থলে, অল্প দূষিত বাতাসে যারা বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত এমন লাইকেন যথেষ্ট আছে।

বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনামূলক ভাবে বাতাস পরীক্ষার জন্য লাইকেন পর্যবেক্ষণ খুবই ভাল পদ্ধতি এবং বিশেষ কোন খরচাই নেই। নিয়ম জানা থাকলে ইচ্ছে করলে, যে কেউই এই পরীক্ষা করতে পারে। বর্তমানে লাইকেনকে 'বায়ো-ইণ্ডিকেটর' হিসাবে ব্যবহার করা হয়। লাইকেন তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সাহায্যে আমাদের আগে থেকেই সেই যায়গার বাতাসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়,—অর্থাৎ সূচক বা নির্দেশকের কাজ করে।

সীমা সেন
তারকমোহন দাস

পদার্থ বিজ্ঞানের এককাবলী

রমানাথ চক্রবর্তী

তোমরা যারা স্কুলে পড়াশোনা করছ বা যারা আগামী বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে—তাদের জন্যই নিচের এককাবলী তৈরি করেছি। এটি মনে রাখতে পারলে তোমরা উপকৃত হবেই।

1. মাপের এককাবলী :—

(ক) মৌলিক একক—(i) দৈর্ঘ্য, (ii) ভর, (iii) সময়

(খ) লব্ধ একক যেমন, ক্ষেত্রফল, আয়তন, ঘনত্ব, বল ইত্যাদি।

একক প্রকাশের পদ্ধতি :—

(i) C. G. S., (ii) F. P. S, (iii) M. K. S.

দৈর্ঘ্যের একক :—ফুট এবং সেন্টিমিটার।

উহাদের সম্পর্ক :—

1 ইঞ্চি = 2.54 সেমি, 1 ফুট = 30·48 সেমি

1 মিটার = 1·0936 গজ = 39·37 ইঞ্চি, 1 বর্গ ইঞ্চি = 6·451 বর্গ সেমি, 1 ঘ. ইঞ্চি = 16·386 সি. সি.

ভরের একক :—গ্রাম ও পাউণ্ড।

উহাদের সম্পর্ক :—

1 পাউণ্ড = 453·59 গ্রাম = 0·4536 কিলোগ্রাম

1 কিলোগ্রাম = 2.204 পাউণ্ড।

আয়তনের একক :—লিটার (1000 c. c.) এবং ঘনফুট ও গ্যালন।

উহাদের সম্পর্ক :—

1 গ্যালন = 0.61 ঘনফুট = 4·54 লিটার, 1 ঘনফুট = 0·25 গ্যালন।

2. **চলন :—**

(ক) সরণ = বেগ × সময়

(খ) দ্রুতি (স্কেলার রাশি) $= \frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}} = \frac{S}{T}$

(গ) বেগ (ভেক্টর রাশি) $= \frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}} = \frac{S}{T}$

(ঘ) ত্বরণ (f) $= \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} = \frac{v}{t}$

(i) দ্রুতি ও বেগের একক :—সেমি / সেকেণ্ড এবং ফুট / সেকেণ্ড

(ii) ত্বরণের একক :—সেমি / sec^2 এবং ফুট / sec^2

(iii) অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) = 981 সেমি / sec^2 অথবা 32.2 ফুট / sec^2

স্থিতি ও গতি :—

ভরবেগ = ভর × বেগ = m × v

একক $= \frac{\text{গ্রাম} \times \text{সেমি}}{\text{সেকেণ্ড}}$ এবং $\frac{\text{ফুট} \times \text{পাউণ্ড}}{\text{সেকেণ্ড}}$

বল = ভর × ত্বরণ = m × f

একক : (i) ডাইন (গ্রাম × সেমি / sec^2)

[যাহা এক গ্রাম ভরে 1 cm / sec^2 ত্বরণ উৎপন্ন করে]

(ii) পাউণ্ড্যাল (পাউণ্ড × ফুট / sec^2)

[যাহা এক পাউণ্ড ভরে 1 ফুট / sec^2 ত্বরণ উৎপন্ন করে]

(iii) নিউটন (কিগ্রা × মিটার / sec^2)

[যাহা 1 কিগ্রা বস্তুতে 1 মিটার / sec^2 ত্বরণ উৎপন্ন করে]

উহাদের সম্পর্ক :—1 পাউণ্ড্যাল = 13825 ডাইন।

বলের অভিকর্ষীয় একক :—

এক পাউণ্ড ওজন হল 32.2 পাউণ্ড্যাল, এক গ্রাম ওজন হল 981 ডাইন।

$\therefore$ 1 পাউণ্ড্যাল $= \frac{\text{1 পাউণ্ড ওজন}}{32\cdot2} = \frac{\text{16 আউন্স}}{32\cdot2}$

$= \frac{1}{2}$ আউন্স (প্রায়)

1 ডাইন $= \frac{\text{1 গ্রাম}}{981} = \frac{\text{1000 মিলিগ্রাম}}{981} =$

= 1 মিলিগ্রাম।

3. **কার্য** (w) = প্রযুক্ত বল × সরণ = p × s

যদি প্রযুক্ত বল এবং সরণের মধ্যে θ কোণ উৎপন্ন করে তখন $W = p.s \cos\theta$ (p = বল, s = সরণ)

একক :—(i) আর্গ [1 ডাইন বল যখন 1 সেমি সরণ উৎপন্ন করে]

(ii) ফুট-পাউণ্ড্যাল [1 পাউণ্ড্যাল বলে 1 ফুট সরণ হয়]

[আর্গ খুবই ছোট একক, বড় একক জুল উহা 10^7 আর্গ-এর সমান যাহা 1 নিউটন বলে 1 মিটার সরণ উৎপন্ন করে]

অভিকর্ষীয় একক

(i) গ্রাম-সেন্টিমিটার এবং (ii) ফুট-পাউণ্ড

(i) এক গ্রাম ভরকে "g"-এর বিরুদ্ধে 1 সেমি উচ্চে তুলিতে যে কার্য হয় তাহা গ্রাম-সেন্টিমিটার = 981 আর্গ।

(ii) 1 পাউণ্ড ভরকে "g"-এর বিরুদ্ধে 1 ফুট উচ্চে তুলিতে যে কার্য করিতে হয় তাহাই ফুট-পাউণ্ড।

1 ফুট-পাউণ্ড = g পাউণ্ডাল = 32·2 পাউণ্ডাল

উহাদের সম্পর্ক :—

1 পাউণ্ডাল ॥ 13825 ডাইন এবং 1 ফুট = 30 48 cm
1 ফুট-পাউণ্ডাল = 30·48 × 13835 আর্গ = $4{\cdot}2 \times 10^5$ আর্গ, 1 ফুট-পাউ = 32·2 × ফুট-পাউণ্ডাল = 32 2 × 4 2 × 10^5 আর্গ = $1{\cdot}35 \times 10^7$ আর্গ = 1·36 জুল।

$$\text{ক্ষমতা} = \frac{\text{মোট কার্য}}{\text{সময়}}$$

একক :—(i) প্রতি সেকেণ্ডে 1 আর্গ কার্য [আর্গ / সেকেণ্ড] ব্যবহারিক একক 1 জুল [10^7 আর্গ] / সেকেণ্ড = 1 ওয়াট] ; 1 কিলোওয়াট = 10^3 ওয়াট।

(ii) ফুট-পাউণ্ডাল / সেকেণ্ড

ব্যবহারিক একক :—প্রতি সেকেণ্ডে 550 ফুট-পাউণ্ড অথবা প্রতি মিনিটে 33000 ফুট-পাউণ্ড কার্য সম্পন্ন হয়। তাহাই হর্স পাওয়ার (H. P.)।

ইহাদের সম্পর্ক :

1 H. P. = 550 ফুট-পাউণ্ড / সেকেণ্ড = 550 × 1·36 × 10^7 আর্গ / sec = 746 জুলস / sec = 764 ওয়াট

1 কিলোওয়াট = 1000 ওয়াট = $\frac{1000}{746}$ = 1·34 H. P. = (1·34 × 550) ফুট-পাউণ্ড / sec.

শক্তি :—কার্যের মোট ক্ষমতা (work capacity)

(ক) স্থিতিশক্তি :—একক P.E.

(i) m গ্রাম বস্তু h সেমি উচ্চতায় = mgh (g = 981) আর্গ।

(ii) m পাউণ্ড বস্তু h ফুট উচ্চতায় = mgh (g = 32·2) ফুট-পাউণ্ড।

(খ) গতিশক্তি (K. E.) m গ্রাম এককে এবং v cm/sec

(i) K. E. = $\frac{1}{2}mv^2$ আর্গ = $\frac{1}{2}mv^2/g$ গ্রাম-সেমি

(ii) m পাউণ্ড এবং v ফুট/sec হইলে, K. E. = $\frac{1}{2}mv^2$ ফুট-পাউণ্ডাল = $\frac{1}{2}mv^2/g$ ফুট-পাউণ্ড।

4. তাপ :

(i) সেলসিয়াস স্কেল [0°C হইতে 100°C]

(ii) ফারেনহাইট স্কেল [32°F হইতে 212°F]

(iii) রোমান স্কেল [0°R হইতে 80°R]

উহাদের সম্পর্ক :

$$\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{R}{4}$$

তাপের একক :—

(i) 1 গ্রাম বিশুদ্ধ জল 14·5°C হইতে 15·5°C তাপমাত্রায় তুলিতে প্রয়োজনীয় তাপ হল ক্যালোরি।

বড় মাপের একক কিলোক্যালোরি [10^3 ক্যালোরি]

(ii) 1 গ্রাম বিশুদ্ধ জলকে 63°F হইতে 64°F তাপমাত্রায় তুলিতে প্রয়োজনীয় তাপ 1 ব্রিটিশ থার্মাল একক (B. Th. U.) বড় একক থার্ম (গ্যাস কোম্পানী ব্যবহৃত) = 10^5 B. Th. U. [1000 পা. জলকে 1°F উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য]

উহাদের সম্পর্ক : 1 B. Th. U. = 252 ক্যালোরি।

তাপগ্রাহিতা ও আপেক্ষিক তাপ :—

আপেক্ষিক তাপ :—একক ভরের বস্তুর একক তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিতে যতগুলি তাপশক্তির এককের প্রয়োজন তাহাই আপেক্ষিক তাপ (S)।

(i) তাপগ্রাহিতা = বস্তুর ভর × আঃ তাপ = m × s (ক্যালোরি / B. Th. U.)

(ii) জলসম = বস্তুর ভর × আঃ তাপ (গ্রাম/পাউণ্ড)

তাপগ্রাহিতা কিছু পরিমাণ তাপ এবং জলসম কিছু পরিমাণ জলকে বুঝায়।

তাপ ও কার্যের সম্পর্ক :

W কার্যকে রূপান্তরিত করিয়া H তাপ উৎপন্ন করিলে জুলের সূত্রানুসারে $\frac{W}{H} = J$

J = $4{\cdot}2 \times 10^7$ আর্গ/ক্যালোরি = 778 ফুট-পাউণ্ড

5. আলোক :

গতিবেগ = প্রতি সেকেণ্ডে 186000 মাইল বা 3×10^5 কিমি, 1 আলোক বর্ষ = $5{\cdot}66 \times 10^{12}$ (প্রায়) মাইল = $9{\cdot}45 \times 10^{12}$ কিমি (প্রায়)।

(i) প্রতিফলনের সূত্র : আপাতন কোণ (i) = প্রতিফলন কোণ (r) ; যখন রশ্মি লম্বভাবে আপতিত হয় তখন Li = 0°, Lr = 0°

(ii) প্রতিসরণের সূত্র বা স্নেল সূত্র : sin i / sin r = μ (মিউ) [ধ্রুবক]

6. বয়েলের সূত্র :

$V \propto \frac{1}{P}$ (V = আয়তন, P = চাপ) অর্থাৎ PV = ধ্রুবক

চার্লসের সূত্র = $V \propto T$

t°C-এ আয়তন = $V_0 \left(1 + \frac{t}{273}\right)$

যে উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন '0' হয় তাহাই পরম উষ্ণতা
V − 273 = $V_0 \left(1 - \frac{273}{273}\right) = 0$ ইহাই কেলভিন স্কেল

t°C = (t + 273) K কেলভিন স্কেলে)

চাপ ও উষ্ণতা যখন উভয়ই পরিবর্তিত হয় $\frac{PV}{T}$ = ধ্রুবক

7. অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প :

একই উষ্ণতা, চাপে ও আয়তনের গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে।

অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা $6.023 \div 10^{23}$

গ্রাম-আণবিক ওজন ঃ—যৌগ ও মৌলের আণবিক গুরুত্ব গ্রামে প্রকাশ হলে ইহাকে গ্রাম-আণবিক ওজন বলে।

গ্রাম-আণবিক আয়তন ঃ—এক গ্রাম-অণু পরিমাণ মৌলিক বা যৌগিক গ্যাসীয় পদার্থ যে আয়তন জুড়িয়া থাকে তাহাকে গ্রাম-আণবিক আয়তন বলে।

প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় উহা = 22·4 লিটার, প্রমাণ চাপ = 760 m.m. এবং তাপ = 0°C

8 শব্দ ঃ শব্দের গতিবেগ

0°C উষ্ণতায় শুষ্ক বায়ুতে শব্দের বেগ 330 m/sec

জলের মধ্যে 1640 m/sec, তামার মধ্যে 3600 m/sec, কাঁচে 5000 m/sec, ইস্পাতে 5100 m/sec

ইহা কিসের উপর নির্ভরশীল ?—"আ-তা" বা "চা-না" আ = আর্দ্রতা, তা = তাপে, বা = বাড়ে, চা = চাপে বাড়ে না।

সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য ঃ—তী-তী-জা ; তী = তীব্রতা, তী = তীক্ষ্ণতা, জা = জাতি।

9. বিদ্যুৎ ঃ

ওহমের সূত্র $V \propto I$, $V \propto IR$; যখন, V = বিভব পার্থক্য, I = তড়িৎ প্রবাহ, R = রোধ

এককাবলী ঃ—I অ্যাম্পিয়ার (যখন পরিবাহীর মধ্য দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে 1 কুলম্ব তড়িতাধান যায়), V = ভোল্ট (যখন পরিবাহীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে 1 কুলম্ব তড়িতাধান পাঠাইতে যদি 1 জুল কার্য হয়), R = ওহম (রোধ)।

রোধের সূত্র ঃ যখন রোধ (= R), দৈর্ঘ্য = l, প্রস্থচ্ছেদ = S একই প্রস্থচ্ছেদ হইলে (i) $R \propto l$

(ii) একই দৈর্ঘ্য এবং একই উপাদান হইলে, $R \propto \frac{1}{S}$

সমীকরণ (i) এবং (ii) হইতে, $R \propto \frac{l}{S}$

$\therefore \ R = P\frac{l}{S}$ P = রোধাঙ্ক

1 সেমি দীর্ঘ এবং 1 বর্গসেমি প্রস্থচ্ছেদের তারের রোধকে রোধাঙ্ক বলে। ইহার একক ওহম সেমি

জুলের সূত্র ঃ—উদ্ভূত তাপ (H), প্রবাহমাত্রা (I), রোধ (R)

(i) $H \propto I^2$ R, t (সময়) স্থির থাকিলে

(ii) $H \propto R$ I এবং t অপরিবর্তিত থাকিলে

(iii) $H \propto t$ I এবং R অপরিবর্তিত থাকিলে

তিনটি সূত্র একত্রিত করিলে,

$H \propto I^2Rt$ বা, $H = KI^2Rt$; I কে অ্যাম্পিয়ারে, Rকে ওহমে এবং tকে সেকেণ্ডে প্রকাশ করিলে [R = 0·24]

$\therefore \ H = 0.24I^2Rt$

ইলেকট্রন ঃ—ভর = 9.1083×10^{-28} গ্রাম, ব্যাস 5·64 ফেমি, আধান = 1.601×10^{-19} কুলম্ব ঋণাত্মক আধান।

প্রোটন = ভর 1.6724×10^{-24}, ব্যাস 2·4 ফেমি, একই ধনাত্মক আধান।

নিউট্রন = ভর = $1.6724 \times {}^{-24}$, ব্যাস 2·4 ফেমি, নিস্তড়িৎ কণা।

পরমাণুর n তম কক্ষে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন = $2n^2$

লাভপুর, বীরভূম।

বলতে পার কার লেখা

'বিজ্ঞান বলিতেছে জগতের শক্তি সমষ্টির হ্রাস বৃদ্ধি নাই, বাহির হইতে নূতন কোন শক্তি আসিয়া শক্তি সৃষ্টির সংখ্যা বাড়াইতে পারে না। রূপান্তর ভাবে মাত্র তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে জড় রাজ্যের বাহির হইতে কি করিয়া হঠাৎ জ্ঞান আসিবে? আমি এই যে দেয়ালে মুষ্ট্যাঘাত করিলাম আঘাত করিবার শক্তি আগে হইতেই অবশ্য আমাতে বিদ্যমান ছিল, তবে সে শক্তি আমাতে লুকাইয়া ছিল মাত্র, এখন তাহাই কার্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মুষ্ট্যাঘাত হইয়া দাঁড়াইল। অচেতন জগতও চেতনাময়—সমস্ত জগতেই প্রাণ ও চেতনা অস্ফুট ভাবে শক্তির আকারে বিরাজ করিতেছে। তাহারি ক্রমোন্নতি দ্বারা ক্রমে সে প্রাণ সে জ্ঞান উদ্ভিদ হইতে ইতর জীব জন্তুতে, ইতর জন্তু হইতে মানবে অধিকতর রূপে পরিস্ফুট হইতেছে মাত্র।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে জড় ও প্রাণ রাজ্যের বস্তুগত প্রভেদ কিছুই নাই—কেবলমাত্র শ্রেণীগত অর্থাৎ সোপানগত বিভেদ। ঐ যে কতকগুলি সোপান রহিয়াছে উহারা একই পদার্থে নির্মিত কেবল উচ্চ নীচতায় পরস্পর প্রভেদ মাত্র। সেইরূপ জড় পদার্থে ও জীবিত পদার্থে সোপান গত প্রভেদ মাত্র।'

স্বর্ণকুমারী দেবী

আজ থেকে 102 বছর আগে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি অসংখ্য বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন। শুধু তাই নয়—অন্যদেরও বিজ্ঞান লেখায় উৎসাহিত করেছেন! তাঁর যাবতীয় বিজ্ঞান রচনা 'পৃথিবী' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বাঁদিকে প্রকাশিত রচনাটি স্বর্ণকুমারীর 'অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাসভূমি কি না?' রচনা থেকে সংগৃহীত। —রবীন বসু

ভগ্নাংশের ভাগে মৌখিক কৌশল

শৈলেন্দ্র মোহন চক্রবর্তী

তোমাদের মধ্যে অনেকেই যারা টি. ভি দেখে থাক তারা বিশ্ববিখ্যাতা গণিত বিদুষী শকুন্তলা দেবীর অনেক গণিত বিষয়ক প্রশ্নের অল্প সময়ে সমাধান নিশ্চয়ই দেখেছ। এর মধ্যে একটি ভগ্নাংশের ভাগ $\frac{1}{19}$ এর সমাধান উনি 25।30 সেকেণ্ডের মধ্যে ডান দিক থেকে উত্তর লিখে সমাধান করেছিলেন। আশ্চর্য নয় কি ? তোমরা শিখবে ? একটু মনোযোগ দিয়ে নিচের লেখা পদ্ধতিটা পড়ে চেষ্টা করে দেখ তোমরাও অল্প সময়ে অনুরূপ ভগ্নাংশের ভাগ মুখে মুখে ডান দিক থেকে সমাধান লিখতে পারবে।

পদ্ধতি—তোমরা জান ভগ্নাংশের উপরের অঙ্কটিকে 'লব' এবং নীচেরটিকে হর বলা হয়। 'লব' অঙ্কটি যখন 1 হইতে 9 পর্য্যন্ত কোন একটি সংখ্যা এবং হরটি এককের ঘরে 9 যুক্ত দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা হবে যেমন 19, 29, 39 ইত্যাদি এই রকম ভগ্নাংশের (যেমন $\frac{3}{19}$, $\frac{5}{19}$....ইত্যাদি) তখন হরের থেকে 1 বাদ দিয়ে উত্তরের সংখ্যাটি কত অঙ্কের হবে তা' জানতে পারবে। যেমন হর যদি 19 হয় তবে উত্তরটি 19-1 = 18 টি অঙ্ক নিয়ে হবে। আরম্ভ করতে হবে 'লব'টিকে ডাইনে দূরে প্রথমে লিখতে হবে। (যেন বাঁ-দিকে মোট 18টি অঙ্ক লেখা যায়)। তার পরে ঐ হর 19 এর সঙ্গে এক 1 মনে মনে যোগ করে 20 এর থেকে শূন্যটি বাদ দিয়ে (অর্থাৎ 2 দিয়ে) পূর্বের লেখা ডান দিকের অঙ্কটিকে (অর্থাৎ লবটিকে) ক্রমাগত গুণ করে এবং হাতের অঙ্কও যোগ করে (যেখানে হাতে কিছু থাকবে) ফল লিখে যাবে এবং এই ভাবে 18টি অঙ্ক লেখা হলেই ফল লেখা শেষ হল। শেষ অঙ্কটিতে (অর্থাৎ আসল ভাগের প্রথম অঙ্কটি) হাতের কিছু থাকলে বাদ দেবে আর কিছু করতে হবে না। শুধু বাঁদিকের প্রথম অঙ্কটির পূর্বে দশমিক বিন্দু ও প্রথম এবং শেষ অঙ্কটির মাথায় পুনঃ-পৌনিক বিন্দুদ্বয় দিয়ে দেবে। এবার ত ফল লেখা আগেই হয়ে গেল। এবার আসল ভাগটি কষে দেখ হুবহু পূর্বের লেখা ফলের সঙ্গে মিলে গেছে। তোমাদের সুবিধার জন্য একটি ফল এবং ভাগটি কষে দেখাচ্ছি। আর একটির শুধু ফলটা লিখছি তোমরা নিজেরা কষে দেখবে। কষে তোমরা খুবই আনন্দ পাবে। $\frac{7}{29}$ এই ভগ্নাংশটির হর 29। সুতরাং $29-1=28$ অঙ্কের ভাগফল হবে। দূরে ডান দিকে 7 লিখে $29+1=30$ দিয়ে ক্রমাগত গুণ করে ফল লিখবে। যেমন এখানে ফল হবে (হাতের 1 বাদ যাবে) 2413 79310 3448 2758 620689 65517 মোট 28টি অঙ্ক) পরে ভাগ করে দেখ। 3 দিয়ে গুণ করবে।

আবার $\frac{9}{19}$

```
19 ) 90 ( 473684210526315789
     76
    ----
    140     80     120     150
    133     76     114     133
    ----   ----   ----    ----
     70     40      60     170
     57     38      57     152
    ----   ----   ----    ----
    130     20      30     180
    114     19      19     171
    ----   ----   ----    ----
    160    100     110       9
    152     95      95
    ----   ----
     80     50     150
            38
           ----
           120
```

[$19-1=18$ ঘরের ভাগফল হয়েছে $19+1=20$ দিয়ে লব (9) কে ডান দিক থেকে ক্রমাগত গুণ করা হয়েছে 18 ঘর পর্যন্ত। বাঁদিকের প্রথম অঙ্কের হাতের অঙ্ক বাদ দেওয়া হয়েছে]

আশা করি তোমরা সকলেই এই রকম ভাগ মুখে মুখে করতে পারবে।

3K নস্কর পাড়া লেন, কল-31

মহাকাশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

অনাদি নাথ দাঁ

আজকের দিনে যখন আমরা টেলিফোনযোগে সাগর পারের কোন দেশের, ধরা যাক্ আমেরিকার কোন শহরের সঙ্গে কথা বলি, তখন ঠিক কোন পথে আমাদের কথাবার্তা বা তা থেকে সৃষ্ট বিদ্যুৎ সংকেত ভ্রমণ করে তা কি আমরা ভেবে দেখি? টেলিফোনে কথা বলা বলতে সাধারণত আমরা বুঝি তারযোগে বিদ্যুৎ সংকেত সরাসরি তারের অপর প্রান্তের গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো। কিন্তু আন্তর্মহাদেশীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আজকাল অন্যরকম।

এক্ষেত্রে, টেলিফোনের প্রেরক যন্ত্র দিয়ে তৈরি বিদ্যুৎ সংকেতটি প্রথমে যায় একটি বিশেষ কেন্দ্রে—যাকে "আর্থ স্টেশন" বলা হয়। এখানে বিদ্যুৎ সংকেতটিকে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গে রূপান্তরিত করে তাকে আকাশে ভূপৃষ্ঠ থেকে 36,000 কি. মি. উচ্চতায় ঘূর্ণমান একটি কৃত্রিম উপগ্রহ অভিমুখে পাঠানো হয়। উপগ্রহে অবস্থিত "ট্রান্সপণ্ডার" (Transponder কথাটি Transmiter এবং Responder কথা দুটির গোড়ার অক্ষরগুলি নিয়ে তৈরি) নামে একটি যন্ত্র ঐ সংকেত গ্রহণ করে তাকে বিবর্ধিত করে এবং তার কম্পাংকের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রাহক যে দেশে অবস্থিত সেই দেশের আর্থ স্টেশনের অভিমুখে সংকেতটি পাঠিয়ে দেয়। আর্থ স্টেশনটি মাইক্রোওয়েভ সংকেতটি নিম্ন কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত করে এবং পরে তা ঐ দেশের টেলিফোন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে যায়। দূরের গ্রাহক যখন কথা বলেন, তখন আবার ঠিক একই পদ্ধতিতে উল্টোপথে তার কথা প্রেরক যন্ত্রে এসে পৌঁছায়। একবার এই রকম যাতায়াতে সংকেতটির এক সেকেণ্ডের এক-তৃতীয়াংশের মত সময় লাগে।

কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ ব্যবস্থায় এত সুবিধা হয়েছে যে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই আজ এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছে এবং পৃথিবীর সমস্ত বৈদেশিক যোগাযোগের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই উপগ্রহ মারফৎ বর্তমানে বহন করা হচ্ছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের যেখানে যা ঘটছে, টেলিভিসনের মাধ্যমে আমরা যে তৎক্ষণাৎ তা অন্য যে কোন দেশে বসে দেখতে পাচ্ছি, এ ব্যবস্থাও সম্ভব হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের দৌলতে। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার এই যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে মহাকাশ সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যার অসামান্য অবদান। মাত্র 40 বছর আগেও যা

K. J. B. June—87/5

ছিল নিছক কল্পনা, ব্রিটিশ পোস্টাফিসে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার আর্থার ক্লার্ক 1945 খ্রীস্টাব্দে যে বিষয়কে কেন্দ্র করে কল্পনার নানা জাল বুনেছিলেন, প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে ষাটের দশকে তা বাস্তব রূপ ধারণ করল।

ষাটের দশকের আগেই অবশ্য মহাকাশ যুগের সূচনা অছে। মানুষের তৈরি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ সোভিয়েত-রাশিয়ার স্পুতনিক-1 1957 খ্রীস্টাব্দের 4ঠা অক্টোবর তারিখে কক্ষপথে স্থাপিত হল। এরই চার বৎসর পরে 1961 খ্রীস্টাব্দে ইউরি গাগারিন ভস্তক-1 মহাকাশযানযোগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে প্রথম মহাকাশচারী হবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করলেন। ঐ দশকের শেষে মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করে নিরাপদে পৃথিবীর বুকে ফিরে এল।

মহাকাশ অভিযানের এই সব সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা বলা বাহুল্য। এক সময় তাই প্রশ্ন উঠেছিল, মানুষের জীবনে এই বিপুল অর্থব্যয়ের সার্থকতা কি। সে সংশয় আজ নিঃসন্দেহে দূর হয়েছে, কেননা কেবল বিশ্বজোড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা নয়, ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে কৃত্রিম উপগ্রহের মূল্যবান অবদানের কথা আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ হিসাবে Echo-1-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ্যালুমিনিয়ম দিয়ে আবৃত 100 ফিট ব্যাসের এই প্লাস্টিক বেলুনটি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে 1000 মাইল ওপরে কক্ষপথে স্থাপিত হয় 1960 খ্রীস্টাব্দে। আমেরিকা ও ইয়োরোপের মধ্যে বার্তা প্রেরণের কাজে এটি অবশ্য নিছক প্রতিফলক হিসাবেই কাজ করত। দর্পণ যেমন আলোক তরঙ্গ প্রতি-ফলিত করে, এই উপগ্রহটি তেমনি পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করে পাঠাত। উপগ্রহের পরিভাষায় এ ধরনের উপগ্রহকে নিষ্ক্রিয় (passive) উপগ্রহ বলা হয়। আজকের যুগের উপগ্রহগুলি কিন্তু সক্রিয় (active) শ্রেণীর। এদের কাজ হল পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে পাঠানো সংকেত গ্রহণ করা, তাদের বিবর্ধিত করা এবং পরিশেষে ভূ-পৃষ্ঠস্থ নির্দিষ্ট গ্রাহককেন্দ্রের অভিমুখে সেই বিবর্ধিত সংকেত পাঠিয়ে দেওয়া।

স্কোর, কুরিয়র, রিলে, টেলস্টার এইগুলি হল প্রথম দিককার কয়েকটি সক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহ। এর মধ্যে 1962 খ্রীস্টাব্দে উৎক্ষিপ্ত টেলস্টার উপগ্রহটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এর সাফল্য প্রমাণ করল টেলিভিসন, টেলিফোন ও অন্যবিধ তথ্য পাঠানোর কাজে কৃত্রিম উপগ্রহ ভূ-পৃষ্ঠস্থ ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

উপরোক্ত উপগ্রহগুলির কিন্তু একটি অসুবিধা ছিল এই যে এদের ঘূর্ণন কাল 24 ঘণ্টার সমান না হওয়ায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ কোন এক স্থানের উপর এরা স্থির থাকে না (এদের এই জন্য সঞ্চরণশীল উপগ্রহ বলা হয়)। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর কোন এক নির্দিষ্ট স্থান থেকে এদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য ভূ-পৃষ্ঠস্থ স্টেশনের অ্যানটেনাগুলি সঞ্চরণশীল উপগ্রহটির অবস্থান অনুসরণ করে ঘোরাতে হত। তা সত্ত্বেও 24 ঘণ্টার সব সময়ের জন্য সংযোগ রক্ষা করা যেত না। আর্থার ক্লার্ক পরিকল্পিত ভূসমলয় কক্ষপথে, ঘূর্ণমান উপগ্রহের কিন্তু এই অসুবিধা নেই। পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে 36,000 কিমি. উঁচুতে অবস্থিত এই কক্ষপথে ঘূর্ণমান উপগ্রহের ঘূর্ণনকাল পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারিপাশে আবর্তনকালের সমান হওয়ায় উপগ্রহ-টিকে পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির বলে মনে হয় এবং সেই কারণে 24 ঘণ্টা ব্যাপী এই ধরনের উপগ্রহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর। স্বভাবতই এই কক্ষপথটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে এবং 1970 খ্রীস্টাব্দে এই কক্ষপথে যেখানে মাত্র 24টি কৃত্রিম উপগ্রহ ঘূর্ণমান ছিল, 1980 খ্রীস্টাব্দে তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 110টি। তবে এই উপগ্রহগুলির অসুবিধে এই যে এদের কক্ষপথে স্থাপন করতে খুবই শক্তিশালী ক্ষেপণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। তুলনায় সঞ্চরণশীল উপগ্রহগুলির কক্ষপথের উচ্চতা অনেক কম হওয়ায় এইগুলি অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়াসে কক্ষপথে স্থাপন করা যায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার মলনিয়া (Molniya) উপগ্রহগুলি এই ধরনের সঞ্চরণশীল কক্ষপথে অবস্থান করে ঐ দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে চলেছে।

যেদিন থেকে দেখা গেল যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কৃত্রিম উপগ্রহ ভূ-পৃষ্ঠস্থ ব্যবস্থার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারে সেদিন থেকে উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় 1964 খ্রীস্টাব্দে। ঐ বৎসরই Intelsat-I ওরফে Early Bird নামক উপগ্রহটিকে তার কক্ষপথে স্থাপন করে ইয়োরোপ ও আমেরিকার মধ্যে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা করা হল। তার পর থেকে ক্রমান্বয়ে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপগ্রহ-গুলির কার্যকারিতা বেড়েছে বহুগুণ। প্রথম দিককার উপগ্রহের তুলনায় এখনকার একটি উপগ্রহস্থিত বেতার প্রেরকযন্ত্রের বিকিরণ ক্ষমতা অন্তত একশত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ গ্রাহক কেন্দ্র বা আর্থ স্টেশন-গুলির আয়তন অনেক ছোট করা সম্ভব হয়েছে। আগে যেখানে 30 মিটার ব্যাসের অ্যানটেনাযুক্ত 30 লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত আর্থ স্টেশন প্রয়োজন হত, এখন সেখানে 30 হাজার ডলার ব্যয়ে নির্মিত 5 মি. ব্যাসের অ্যানটেনা সমন্বিত আর্থ স্টেশন হলেই চলে। আর্থ স্টেশনের ব্যয় এত কমে যাওয়ার ফলে বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এখন সরাসরি উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন প্রায় আয়ত্তাধীন হয়েছে বলা যায়।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলির আয়ু ও বার্তাবহনের ক্ষমতাও বেড়েছে অনেক। Intelsat-1-এর আয়ু ছিল $1\frac{1}{2}$ বৎসর এবং এটি 240টি দুমুখী টেলিফোন সার্কিট বহন করত। তুলনায় বর্তমানের Intelsat-v পর্যায়ের উপগ্রহগুলি 12,500টি দুমুখী টেলিফোন এবং 2টি টেলিভিসন চ্যানেল বহন করে এবং এর আয়ু হবে অন্তত 7-10 বছর। প্রতিটি সার্কিটের জন্য আগে যেখানে প্রতি বৎসর 30,000 ডলার ব্যয় হত, এখন তা কমে 70) ডলারে দাঁড়িয়েছে।

উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ ব্যবস্থায় মাইক্রোওয়েভের দুটি বিশেষ কম্পাঙ্ক ব্যাণ্ডে সংকেত পাঠানো হয়ে থাকে। এ দুটি হল সি ব্যাণ্ড (4-6 গি-হা) ও কে-ইউ ব্যাণ্ড 12-14 গি-হা)! এ দুটি ব্যাণ্ডের মধ্যে সি ব্যাণ্ডের ব্যবহার অনেকগুণ বেশি। তার একটি প্রধান কারণ এই যে পৃথিবী পৃষ্ঠে মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই কম্পাঙ্কের সংকেত আগে থেকেই ব্যবহৃত হওয়ার দরুন এই কম্পাঙ্কে সংকেত আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশল বিজ্ঞানীদের জানা ছিল।

সি ব্যাণ্ডের মোট বিস্তার 3-7 গি-হা থেকে 6-4 গি-হা। এর মধ্যে 3·7 গি-হা থেকে 4·2 গি-হা পর্যন্ত কম্পাঙ্ক উপগ্রহ থেকে ভূ-পৃষ্ঠে এবং 5 9 গি-হা থেকে 6·4 গি-হা পর্যন্ত কম্পাঙ্ক ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপগ্রহে সংকেত পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী সংকেত দুটি যাতে পরস্পরের মধ্যে কোনরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে তার জন্যই এই রকম আলাদা আলাদা কম্পাঙ্ক ব্যবহারের ব্যবস্থা।

উপরোক্ত দুটি কম্পাঙ্ক ব্যাণ্ডকেই আবার 24টি করে চ্যানেলে ভাগ করা হয়েছে। কাছাকাছি অবস্থিত প্রেরক ও গ্রাহক কেন্দ্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেল ব্যবহার করে। তার ফলে একের প্রেরিত সংকেত অপরের প্রেরিত সংকেত কর্তৃক বিঘ্নিত হয় না। এক একটি চ্যানেল সাধারণত 1000 থেকে 1500টি কথাবার্তার বর্তনী ও 1টি বা 2টি টেলিভিসন চ্যানেল বহন করে।

এখন সমস্যার কথা এই যে, সি ব্যাণ্ডে চ্যানেলের সংখ্যা সীমিত বলে ঐ ব্যাণ্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে ব্যাণ্ডটিতে স্থানাভাব দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে কে ইউ ব্যাণ্ডের ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে। সি ব্যাণ্ডের তুলনায় কে-ইউ ব্যাণ্ডটি কতকগুলি বিষয়ে বেশি সুবিধাজনক। সি ব্যাণ্ডে সংকেত পাঠানো ও গ্রহণ করার জন্য অনেক বড়ো আকারের অ্যানটেনার প্রয়োজন। আবার ভূ-পৃষ্ঠস্থ মাইক্রো-ওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থার সংকেত যাতে উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার সংকেতকে কোন রকম বিঘ্নিত না করে (যেহেতু এরা উভয়েই একই কম্পাঙ্কে কাজ করে), তার জন্য উপগ্রহ ব্যবস্থার ভূ-পৃষ্ঠস্থ কেন্দ্রগুলির অবস্থান নির্ণয়ে কিছু সতর্কতা দরকার হয়ে পড়ে।

কে-ইউ ব্যাণ্ডের কম্পাঙ্ক ভিন্ন হওয়ায় স্বভাবতঃই এতে শেষোক্ত অসুবিধেটি নেই। কম্পাঙ্ক বাড়ার সাথে সাথে অ্যানটেনার আকার ছোট হয় বলে কে-ইউ ব্যাণ্ডের অ্যানটেনা-গুলি আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, যার ফলে সেগুলিকে বাড়ির ছাদেও বসানো যায়। এছাড়া কম্পাঙ্ক বেশি হওয়ার জন্য অধিকতর সংখ্যক চ্যানেলের সংস্থান হওয়ার সুবিধা তো আছেই। কিন্তু বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে যাবার সময় এই ব্যাণ্ডের সংকেতের শক্তি বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

কে-ইউ ব্যাণ্ডটিও কয়েক বছরের মধ্যে ভরে যাবে বলে বিজ্ঞানীরা এখন থেকেই কে-এ (18 থেকে 30 গি-হা) নামে আর একটি ব্যাণ্ড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন। কে-ইউ ব্যাণ্ডের সুবিধাগুলি এই ব্যাণ্ডে আরো বেশি মাত্রায় বিদ্যমান, কিন্তু বৃষ্টিপাতজনিত অসুবিধাও এই ব্যাণ্ডে আরো বেশি তীব্র। এ নিয়ে এখন জোর গবেষণা চলছে।

সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানীগণ আরও অনেক অগ্রসর হয়েছেন। পরবর্তী কালে এ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

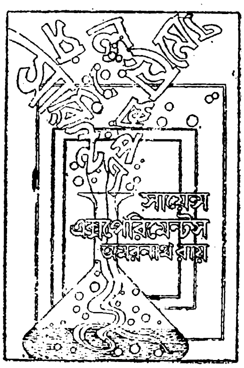

বিজ্ঞানের পঞ্চাশটি অভিনব খেলা নিয়ে লেখা আশ্চর্য বই!

অমরনাথ রায়ের

সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্টস্ ১০·০০

যা তোমরা স্কুলের ল্যাবরোটারীতে বা বাড়িতে বসেই পরীক্ষা করতে পারো

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কল-9

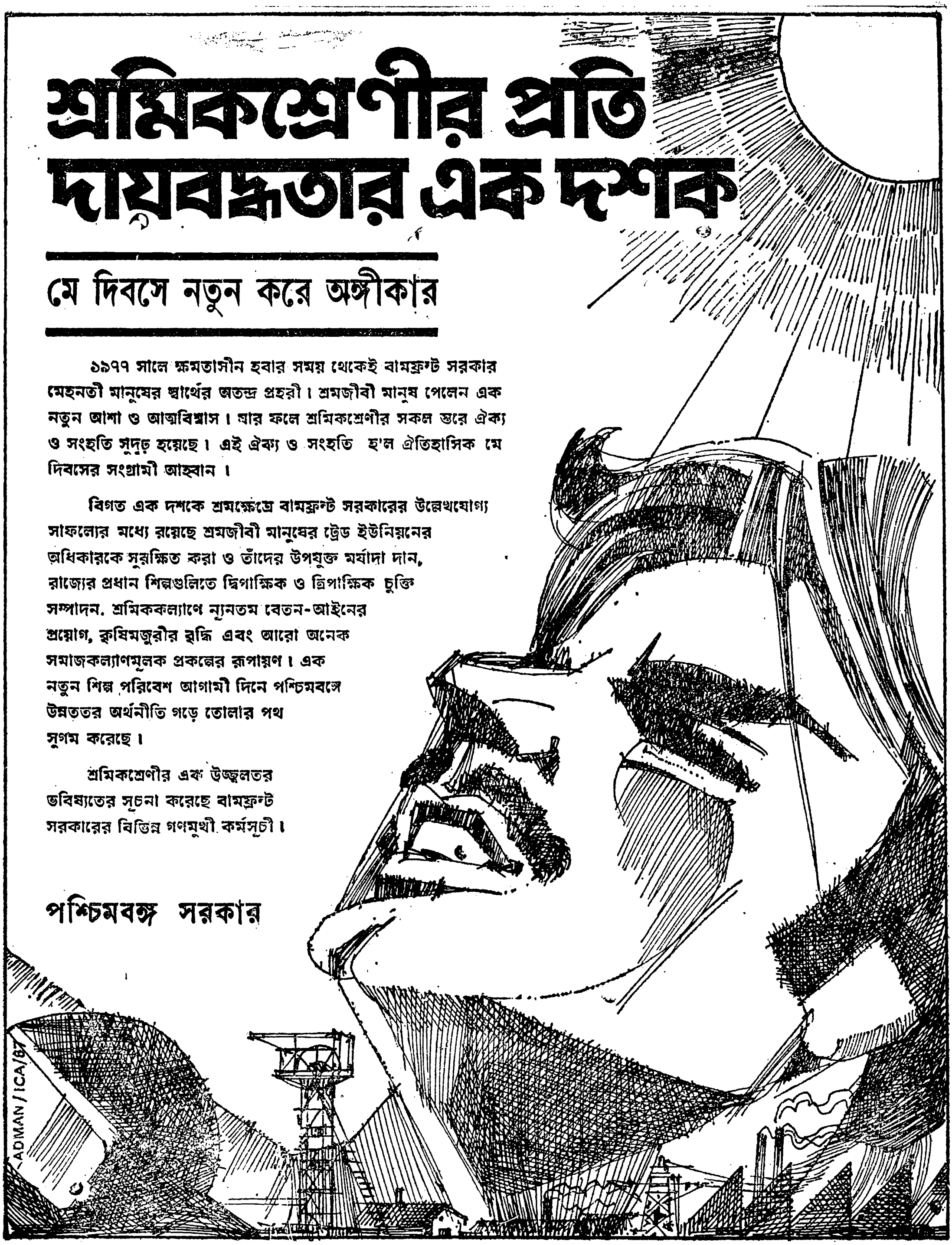
শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধতার এক দশক
মে দিবসে নতুন করে অঙ্গীকার
১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হবার সময় থেকেই বামফ্রন্ট সরকার মেহনতী মানুষের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। শ্রমজীবী মানুষ পেলেন এক নতুন আশা ও আত্মবিশ্বাস। যার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সকল স্তরে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়েছে। এই ঐক্য ও সংহতি হ'ল ঐতিহাসিক মে দিবসের সংগ্রামী আহ্বান।
বিগত এক দশকে শ্রমক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকে সুরক্ষিত করা ও তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দান, রাজ্যের প্রধান শিল্পগুলিতে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন. শ্রমিককল্যাণে ন্যূনতম বেতন-আইনের প্রয়োগ, কৃষিমজুরীর বৃদ্ধি এবং আরো অনেক সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ। এক নতুন শিল্প পরিবেশ আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে উন্নততর অর্থনীতি গড়ে তোলার পথ সুগম করেছে।
শ্রমিকশ্রেণীর এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সূচনা করেছে বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন গণমুখী কর্মসূচী।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ADMAN/ICA/87

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
ওকি রে পটল, সাইকেলটাকে অযথা এমন দুরমুশ করছিস কেন?
দুরমুশ নয়, রিমডেলিং করছি।
কি মডেলিং করছিস?
রিমডেলিং জান না? মানে নতুন রূপ দিচ্ছি।
এই মডেলটা কি এমন দোষ করলো যে হাতুড়ি নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছিস?
এটা আছে ট্রাইসাইকেল, এখন এটাকে বাইসাইকেল বানাবো। বড় হয়েছি তো, এখনও ট্রাইসাইকেল চড়তে দেখলে লোকে কি বলবে? তাই—
তোর দাদু জানতে পারলে তো অবস্থা ঘোলো করে ছেড়ে দেবে রে!
হুঁঃ, তার আগেই আমি এটাকে বাইসাইকেল বানিয়ে দাদুর কাছে হাজির করবো। এবং একটার বদলে অন্য একটা দেখলে দাদু নিশ্চয়ই কিছু বলবে না, কি বলিস?
শোন পটল, এ কাজটা তুই আমার হাতে ছেড়ে দে। এ সব টেকনিক্যাল কাজ তুই পারবি না।
না-না, এর মধ্যে তোকে নাক গলাতে হবে না। এ-আমিই পারবো।

পারবো বললেই হল! সরে যা, আমি দেখছি কি করতে পারি।
যা ব্বাবা!
এবার তুই দাঁড়িয়ে দ্যাখ কি করে কি করতে হয়। বাই মানে দুই, সুতরাং একটা চাকা খুলে নিতে হবে। মারো জোয়ান হেঁইও-ও!
এ কি করছিস তোরা?
মরেছে! মাস্টারমশাই পড়াতে এসে গেছেন! খু-খুদে—
খুলেছি-ওয়াফস্!
গদাম্
ওঁক্!
ঘচাং-ং-ং
JUNE-87
বাব্বাঃ, যা টাইট হয়ে লেগেছিল! প্রথম পর্যায় শেষ এবার দ্বিতীয় পর্যায়!
!
হুঁ-হুঁ ব্বাবা, এ সব টেকনিক্যাল কাজ কি যার তার পক্ষে সম্ভব! এবার বাকি কাজটা—ইক্.
তুই, মানে আপনি, মানে কো-কো-কি-করে?!
বেল্লিক, এবার বাকি কাজটা আমিই করবো!

উঁ-উঁ-উঁরে বাবারে-এ-এ-এ!
ঢক-ঢকাং-ঢকাং
বিটলে পাজি, পালাবি কোথায়? আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!
ওরে পটল, একি ফ্যাসাদে পড়লুম! আমাকে বাঁচা!
বেচারা!
আইব্বাস!
হুম্!
উপস্!
সাব্বাস্, যেমন তোর টেকনিক্যাল ব্রেন তেমনি তোর বুদ্ধি!
অদ্ভুত! জোরসে প্যাডেল কর। মাস্টারমশাই ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন!

যাক, খুদের বিপদ আপাতত কেটে গেছে!
বাব্বাঃ, খুদে তো দেখছি ট্রাই-সাইকেলকে সত্যি সত্যিই বাইসাইকেল বানিয়ে ফেলল!
উফ্-উফ্! ধরতে পারলে—উফ্—
অ্যাঁ, উল্লুকটাকে তো দেখছি না! কোথায় গেল?
ও হতচ্ছাড়া, তুই আমার পেছনে? মতলববাজ!
এ্যাই এ্যাই, ভাল হবে না বলছি! থাম! নয়তো—
থাম বলছি, নয়তো একটা এ্যাকসিডেন্ট-ম্যাকসিডেন্ট করে ফেলবি! উফ্-উফস্-উফ্!
ওরে বাবা একি কান্ড! বাই-সাইকেলে চড়ে খুদে এখন মাস্টারমশাইয়ের পেছনে ধাওয়া করেছে!
ঘড়াম
গর-র-র-র!
উঁ-উঁ-উঁ!
খুদের সবেতে ওস্তাদি! মনে হচ্ছে আজকে মাস্টারমশাই সারাক্ষণ খুদেকে নিয়েই ব্যাস্ত থাকবেন সুতরাং বাকি কাজটুকু আমি নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারবো।

ইলেকট্রনিক্‌সের কথা ঃ এক

বিপ্লব ব্যানার্জি

টমাস আল্‌ভা এডিসনের নাম জানে না, এমন লোক বোধ হয় খুব কমই আছে। 300-রও কিছু বেশি ইলেকট্রিকাল ও ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্র এবং বহু মৌলিক তত্ত্বের আবিষ্কারক এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী 1879 সালে সর্বপ্রথম incandenscent lamp তৈরি করে সারা বিশ্ববাসীকে আলোকিত করেন। এর ঠিক দু'বছর আগে অর্থাৎ 1877 সালে উনি অত্যন্ত সংবেদনশীল microphone তৈরি করে বহু বিজ্ঞানীর অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। Diode বা Rectifier-এর উপর উনিই প্রথম 1883 সালে বেশ কিছু আলোকপাত করেন যা আজও Edison Effect of Electricity নামে খ্যাত। এদিকে 1901 সালে এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী Richerdson পরীক্ষা করে দেখলেন যে প্রায় সব ধাতুই উত্তপ্ত অবস্থায় electron ত্যাগ করে। Thermoisnic emission-এর উপর প্রচুর গবেষণা করে এই বিজ্ঞানী 1928 সালে নোবেল পুরস্কার লাভের দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হন, যার পুরো নাম Owen Williams Richerdson। Edison এবং Richerdson-এর কাজের উপর ভিত্তি করে Sir John Fleming 1904 সালে এক ধরনের Rectifier valve তৈরি করলেন যা বিদ্যুৎপ্রবাহকে একমুখী করতে সক্ষম হয় এবং উনি তার নাম দেন Fleming valve। Electric বাল্বের ক্ষেত্রে একটি প্রায় বায়ুশূন্য কাঁচের বাল্বের মধ্যে টাঙ্গস্টেন নামক অত্যন্ত সূক্ষ্ম তারের কুণ্ডলী রেখে এবং কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করলে কুণ্ডলী এত উত্তপ্ত হয়ে পড়ে যে একসময় তা থেকে চতুর্দিকে আলোর বিকিরণ ঘটে। এই ছিল Edison lamp-এর মূল কথা। আর Diode valve-এর ক্ষেত্রে বায়ুশূন্য কাঁচের বাল্বে থাকে Directly heated বা indirectly heated cathode আর cathode থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করে Anode electrode-টি। এখন এই Anode-এ +ve voltage এবং cathode-এ −ve voltage দিলে ফিলামেন্ট দ্বারা উত্তপ্ত cathode থেকে electron কণিকা উৎক্ষিপ্ত হয় যা anode-এর দিকে ধাবিত হয় এবং বাল্বের মধ্যে cathode থেকে anode-এর দিকে একটি একমুখী বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে আর বহির্বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে anode থেকে cathode-এর দিকে। এই হল diode valve-এর গোড়ার কথা। এদিকে টমাস আল্‌ভা এডিসনের পরেই আরও একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম আমাদের প্রত্যেকের অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। যার নাম Lee de Forest। এই Lee de Forest 1873 সালে আমেরিকার আইওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র 26 বছর বয়সে 1899 সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Doctorate degree লাভ করেন। ফিল্মে শব্দ গেঁথে রাখার উপায় থেকে শুরু করে বহু খুঁটিনাটি যন্ত্র উনি তৈরি করতে সক্ষম হন। ওঁর কাজের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান যুগের Television, Radar, Computer, Satellite প্রভৃতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই লী ডি ফরেস্টই 1907 সালে diode valve-এর দুটো তড়িৎদ্বারের মাঝখানে আরও একটা সছিদ্র তড়িৎদ্বারের সংযোগ করলেন, যাকে বলা হয় grid। এর ফলে উত্তপ্ত ক্যাথোড থেকে উৎপন্ন electron কে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। cathode, grid এবং anode এই তিনটি electrodc নিয়ে যে ভাল্ব তৈরি হল তাকে বলা হয় ট্রায়োড ভাল্‌ভ (Triode valve)। তখনকার যুগে এই triod valve কে বলা হত Audion valve বা Audion tube। ইলেকট্রনিক বর্তনীর হেরফের ঘটিয়ে এই triode valve কে Amplifier, Oscillator ইত্যাদি নানা ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হল। আস্তে আস্তে পরবর্তী যুগে একটা করে electrode বাড়িয়ে Tetrode, Pentode, Hexode, Heptode ইত্যাদি বহুবিধ ভাল্ব তৈরি করা সম্ভবপর হয়ে উঠল। বর্তমান যুগে নামের শেষে —'tron' যুক্ত হয়ে 600-রও কিছু বেশি বিভিন্ন ধরনের electron valve তৈরি করা সম্ভবপর হয়েছে। এদিকে ভাল্বের পাশাপাশি পরিবাহী (conductor), অন্তরক (insulator) এবং অর্ধপরিবাহী (semiconductor) নিয়ে বহু বিজ্ঞানী নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। শুরু হল বিভিন্ন ধাতু ও ধাতুযৌগের উপর তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ-প্রবাহ ও চৌম্বক প্রবাহের প্রভাব নিয়ে নানাবিধ গবেষণা। ভাল্ব ও semiconductorনিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হয়ে গেল, কে কার থেকে বেশি এগিয়ে যেতে পারে। ভাল্বকে চালাতে গেলে প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তির ও স্থানের প্রয়োজন হয় কিন্তু semiconductor দিয়ে তৈরি কোন electronics

বস্তুকে কাজ করাতে গেলে ভাল্বের তুলনায় অনেক অনেক কম বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয় এবং আকৃতি বা size-ও খুব ছোট আর টেঁকে অনেকগুণ বেশি। আবার অন্যদিকে semiconductor দ্বারা তৈরি কোন electronic component কাঁচের ভাল্বের মত বিন্দুমাত্র ক্ষণভঙ্গুর নয়। হাত থেকে পিছলে মাটিতে পড়ে গেলেও semiconductor নির্মিত বস্তু একরকম অবিকৃত থাকে। এভাবে semiconductor-এর কদর ক্রমশই বাড়তে থাকল। semiconductor বস্তু কি এবং কেমনভাবে কাজ করে তা মানুষ আরও শ্রদ্ধার সঙ্গে জানার নেশায় মেতে উঠল। যদিও valve এবং transistor দুইয়ের ক্ষেত্রেই মূল তত্ত্ব প্রায় একই। Source, load এবং drain এই তিনটির মাধ্যমে একটা electron flow ঘটানো এবং তাকে প্রয়োজন অনুসারে ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করা। valve-এর ক্ষেত্রে যেমন cathode, grid ও anode থাকে তেমনি transistor (transfer resistance)-এর ক্ষেত্রে থাকে যথাক্রমে emitter, base ও collector। valve হল voltage actuated device আর transistor হল current actuated device। valve কে সাধারণতঃ voltage amplifier হিসাবে কাজ করান হয় আর transistor কে সাধারণতঃ current amplifier হিসাবে কাজ করান হয়, এই হল valve ও transistor-এর মূলগত পার্থক্য।

এদিকে semiconductor এবং transistor-এর উপর অসামান্য কাজ করে বিরল প্রতিভাধর তিন সমসাময়িক বিশ্ব-বিখ্যাত স্বনামধন্য বিজ্ঞানী John Bardian, William Sharkley এবং Walter Brattain 1956 সালে নোবেল পুরস্কারের দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হন। বর্তমানে electronics যুগের যাবতীয় চাবিকাঠি হল এই semiconductor, যার দ্বারা transistor, light, emitting diode, gunn diode, IMPATT diode, FET, MOSFET, op-amp ইত্যাদি হাজারখানেক semiconductor device তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই transistor সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে গেলে conductor এবং semiconductor-এর উপর একটা পরিষ্কার বা ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এখন conductor বলতে আমরা বুঝি যার মধ্য দিয়ে খুব সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে। মোটামুটি প্রায় সব ধাতুই বেশ ভাল conductor-এর কাজ করে। যেমন, রুপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার সব চেয়ে ভাল electrical conductor-ই খুব ভাল thermal conductor-এর কাজ করে। যে সব ধাতুগুলি ভাল তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহকের কাজ করে তাদের ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে তাদের পরমাণুগুলির সর্বশেষ কক্ষে অর্থাৎ outermost orbit-এ কিছু মুক্ত বা free electron আছে, যাদের কোন ভাবে agitate বা উত্তেজিত করলে পরিবাহকের উপরিতলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর একটা স্রোত বয়ে যায় যা বহির্বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এখন এই free electron-গুলিকে তাপ, আলোক, ঘর্ষণ, কম্পন, চৌম্বক অক্ষরেখা, X-রশ্মি, তেজস্ক্রিয় রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রা, আলট্রাভায়োলেট ray, কস্‌মিক ray ইত্যাদির যে কোন কিছুর প্রভাব দ্বারা খুব সহজেই উদ্দীপ্ত করা যায়। যে কোন মৌলের পরমাণুর outermost orbit-এর মুক্ত ইলেকট্রনগুলি নানা ছুতোনাতায় একটা না একটা তৃতীয় হাত অর্থাৎ অজুহাত দেখিয়ে পরমাণুর শেষ কক্ষের গম্ভীর টান ছেড়ে বাইরের মুক্ত পরিবেশে বেরিয়ে পড়ার একটা সহজাত প্রবৃত্তি বা টান থাকে আর এই টানটিকে আমাদের প্রয়োজন মত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং electron combination এর কাজে লাগানো হয়। কোন মৌলের পরমাণুর শেষ কক্ষে যতগুলি ইলেকট্রন থাকে সেই সংখ্যাটিকে বলা হয় সেই মৌলের যোজ্যতা বা valancy। আর শেষ কক্ষের ইলেকট্রনগুলিকে বলা হয় valancy electrons। দুটি মৌলের শেষ কক্ষের electrons-এর আদান-প্রদান সংঘটিত হয় valancy bond-এর মাধ্যমে। এখন যে ধাতু যত বেশি মুক্ত electron পরিবহন করতে সক্ষম সে তত বেশি ভাল পরিবাহকের কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে তামা ধাতুটি খুব ভাল বিদ্যুৎ পরিবাহকের কাজ করে। তামার বিদ্যুৎ পরিবাহিতা হল $1{\cdot}57 \times 10^{-6}$ ohm-cm।

অন্যদিকে কাঁচ, যাকে আমরা একটা ভাল অন্তরক বা insulater হিসাবে জানি তার পরিবাহিতা হল 10^{12}ohm cm। এখন semiconductor technology-তে যে যে মৌলগুলি ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয় তারা হল যথাক্রমে সিলিকন (Si) এবং জার্মেনিয়াম (Ge)। এখন Si ও Ge-এর পারমাণবিক সংখ্যা হল যথাক্রমে 14 ও 32। সিলিকনের তিনটি shell K, L ও M-এর ইলেকট্রন বিন্যাস হল যথাক্রমে 2, 8 ও 4 এবং জার্মেনিয়ামের চারটি shell K, L, M ও N-এ ইলেকট্রনের বিন্যাস হল যথাক্রমে 2, 8, 18 ও 4 অর্থাৎ উভয়েরই শেষ কক্ষে 4টি করে ইলেকট্রন বর্তমান। এখন Silicon (Si), Germenium (Ge), Tin (Sn), Lead (Pb) ইত্যাদি মৌলগুলি হল পর্যায়-সারণীর Group IV A-এর অন্তর্ভুক্ত। বোরন (B), অ্যালুমিনিয়াম (Al), গ্যালিয়াম (Ga), ইনডিয়াম (In) প্রভৃতি মৌলগুলি পর্যায় সারণীর Group III-A-এর অন্তর্ভুক্ত এবং ফসফরাস (P), আর্সেনিক (As) ও অ্যান্টিমনি(Sb) মৌলগুলি পর্যায়সারণীর Group V-A-এর অন্তর্ভুক্ত।

B, Al, Ga, In ইত্যাদি মৌলগুলির পরমাণুর শেষকক্ষে 3টি করে এবং P, As ইত্যাদি মৌলগুলির পরমাণুর শেষ কক্ষে 5টি করে electron বর্তমান। এখন আমরা জানি যে

(পরের অংশ 30 পৃষ্ঠায়)

নতুন সুপারনোভা

মৃণ্ময়ী দাস

1987 সালের 24শে ফেব্রুয়ারী, দিনটা ছিল মঙ্গলবার। চিলির লস কামপালাস মানমন্দিরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী আয়ান শেলটন একটা পুরনো দূরবীনের সাহায্যে বৃহৎ ম্যাগেলান মেঘের মধ্যে অবস্থিত নক্ষত্রগুলিকে দেখছিলেন আর প্রয়োজনমত ছবিও তুলছিলেন। তোলা ছবিগুলো ডেভেলাপ করতে গিয়ে তিনি ছবিটিতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে দেখতে পেলেন, যাকে ঘিরে রয়েছে অনেকগুলি ছোট ছোট নক্ষত্র। যেন একটি মাকড়সা তার জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে বসে আছে, আর তাকে ঘিরে রয়েছে সদ্য ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা অসংখ্য খুদে মাকড়সার বাচ্চা। ওই একই অঞ্চলে তাঁর তোলা আগের দিনের ছবিটিতে কিন্তু এইসব ছোট নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি। শেলটন বুঝলেন, উজ্জ্বল নক্ষত্রটি একটি বিস্ফোরণরত নক্ষত্র অর্থাৎ সুপারনোভা, যার বিস্ফোরণে জন্ম হয়েছে অসংখ্য নক্ষত্রিক বস্তু। নিউজিল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট জোন্স এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের রবার্ট ম্যাকনটও প্রায় একই সময়ে ওই অঞ্চলে জ্যোতিষ্কটিকে দেখতে পান। নক্ষত্রটির অস্তিত্ব বৃহৎ মেঘের মধ্যে আগেও ছিল, কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্য এত বেশি ছিল না, কেননা তখন সেটিতে বিস্ফোরণ ঘটে নি। 1604 সালে কেপলার আমাদের গ্যালাক্সিতে এইরকম একটি নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ লক্ষ্য করেছিলেন, বর্তমানকালের বিজ্ঞানীরা তা লক্ষ্য করলেন আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সিতে। বিস্ফোরণরত এই নক্ষত্রটির ভর সূর্যের ভরের 30 গুণ বেশি। বিস্ফোরণের পর তার ঔজ্জ্বল্য বেড়ে হয়েছে 10 কোটি সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের সমান। এটির অবস্থান পৃথিবী থেকে 170000 আলোক বৎসর দূরে। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ গোলার্ধে এটিকে খালি চোখেই দেখা গেছে।

কখন নক্ষত্রে ঘটে বিস্ফোরণ? আর কেনই বা তা সব নক্ষত্রে ঘটে না? এই দুটি প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর বিজ্ঞানীদের এখনও জানা নেই।

পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে মহাজাগতিক গ্যাসীয় মেঘ ও বস্তুকণা এক জায়গায় জড় হতে থাকে,—জন্ম হয় নক্ষত্রের। বস্তুপুঞ্জও যত বড় হতে থাকে, তার কেন্দ্রাভিমুখী মাধ্যাকর্ষণ বলও ততই বাড়তে থাকে, কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড চাপ। চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপও বাড়তে থাকে। 100,000 থেকে 10 কোটি বছর পরে কেন্দ্রে তাপ এতই বেড়ে যায় যে নক্ষত্রটির মধ্যে তাপপারমাণবিক বিক্রিয়া আরম্ভ হয়। নক্ষত্রের হাইড্রোজেন সংযোজিত হয়, পরিণত হয় হিলিয়াম ও শক্তিতে। এই শক্তি মাধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীত দিকে বল সৃষ্টি করে বস্তুকণাগুলিকে কেন্দ্রের বিপরীতে সরিয়ে রাখে, ফলে নক্ষত্রটির ভারসাম্য ও স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা পায়। নক্ষত্রের হাইড্রোজেন শেষ হয়ে গেলে, নক্ষত্রে আবার সংকোচন হয়, তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে এবার নক্ষত্রের হিলিয়াম সংযোজিত হয়ে কার্বনে পরিণত হয় ও শক্তি নির্গত হয়। এইভাবে তাপপারমাণবিক সংযোজনের ফলে লোহা, সীসা প্রভৃতি ভারী মৌলিক পদার্থ তৈরি হতে থাকে ও শক্তি নির্গত হয়। সংকোচনের শেষ পর্যায়ে দুটি ব্যাপার ঘটতে পারে। নক্ষত্রটির ভর সূর্যের ভরের থেকে কম হলে তা শ্বেতবামনে পরিণত হবে যার কেন্দ্রে ইলেকট্রন জমাট বেঁধে থাকবে। নক্ষত্রটির ভর যদি সূর্যের থেকে অনেক গুণ বেশি হয়, তার মধ্যে সংকোচন ঘটবে খুব দ্রুতগতিতে। কোনও এক সময়ে নক্ষত্রটি তার স্থিতিস্থাপকতা হারাবে, তখন তার মধ্যে ঘটবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—সৃষ্টি হবে নোভা বা সুপারনোভা।

সুপারনোভা দুই শ্রেণীর। প্রথমটি প্রধানত শ্বেতবামন নক্ষত্র, বিস্ফোরণ হলেও যার কণা মহাকাশে খুব বেশি ছড়ায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারনোভায় বিস্ফোরণ ঘটলে নক্ষত্রটির বাইরের অংশ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে, আর ভিতরের অংশটি পরিণত হয় ব্ল্যাকহোলে। এবারের সুপারনোভাটি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। নক্ষত্রের বিস্ফোরণ কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েকমাস পর্যন্ত চলতে পারে। বিস্ফোরণের ফলে যদি অল্প পরিমাণ বস্তু মহাকাশে ছড়ায় এবং মহাকাশে বিস্ফোরণরত নক্ষত্রটির স্থায়িত্ব যদি 30 দিনের কম হয়, তাকে বলে নোভা। নোভার ঔজ্জ্বল্য সুপারনোভার তুলনায় অনেক কম এবং নোভা থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণ সুপারনোভার শক্তির 10 হাজার ভাগের এক ভাগের মত। সুপারনোভার তুলনায় নোভার সংখ্যা বেশি। গত 100 বছরে আমাদের গ্যালাক্সিতে পাঁচটি নোভা দেখা গেছে, 1901, 1918, 192 , 1942, ও 1976 সালে। সেখানে 400 বছর পরে আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সিতে সুপারনোভা দেখা গেল মাত্র একটি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণের ফলে, দ্রুতগতিসম্পন্ন নক্ষত্র, এক্স-রে, উচ্চবেগসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি মহাজাগতিক কণা, নিউট্রিনো, নানারকম ভারী মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে, সৃষ্টি হতে পারে পালসার, এমনকি নিউট্রন নক্ষত্র ও ব্ল্যাকহোল। বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের কেন্দ্র থেকে দ্রুতগতিতে নিউট্রিনো, নানারকম পারমাণবিক কণা ও শক্তি বেরিয়ে আসে, পড়ে থাকে কেবল প্রোটন। সঙ্কোচন খুব বেশি হওয়ায় চাপও হয় খুব বেশি। তখন বাইরের ইলেকট্রন কণা কেন্দ্রের প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে নিউট্রন—নক্ষত্রটি হয়ে দাঁড়ায় নিউট্রন নক্ষত্র, যার ভর প্রতি ঘনসেণ্টিমিটারে 10^{15} গ্রাম। সঙ্কোচন ও চাপ আরও বেশি বেশি হলে সৃষ্টি হয় ব্ল্যাকহোল, যা প্রবল মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে সব কিছুই গ্রাস করে, এমনকি আলোকরশ্মিও। বিজ্ঞানীদের মতে 1054 সালে সুপারনোভার বিস্ফোরণের ফলে 'ক্র্যাব্‌নীহারিকার সৃষ্টি হয়েছে। এই নীহারিকা অঞ্চলে ব্ল্যাকহোল্‌ ও নিউট্রন নক্ষত্রের অস্তিত্ব আছে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান।

সুপারনোভার বিস্ফোরণে মাধ্যাকর্ষণ বিকিরণের সৃষ্টি হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন! বর্তমানের সুপারনোভাটির ওপর পর্যবেক্ষণের জন্য মহাকাশে পাঠানো হয়েছে তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ, আর পৃথিবীতে ব্যবহার করা হচ্ছে দুটি বিশেষ ধরনের দূরবীন! সুপারনোভার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করতে পারলে মহাকাশের অনেক রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব বলে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীদের ধারণা।

জেনে রাখো

এক: **নিউট্রিনো:** একপ্রকার মৌলিক কণা যার ভর শূন্য এবং চার্জবিহীন অর্থাৎ বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ। বড় নক্ষত্রের অভ্যন্তরীণ গঠনে নিউট্রিনোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

দুই: **অ্যাসটরয়েড:** ছোট গ্রহ বা গ্রহাণু। সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণরত প্রায় 1500টি ছোট গ্রহের একটি বন্ধনী আছে যার ব্যাস 300 মাইলের মত। এদের অধিকাংশের পরিক্রমণপথ মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের অন্তর্বর্তী স্থান।

তিন: **করোনা:** সূর্যের বহির্মণ্ডলের শ্বেতবর্ণ ক্ষীণ-প্রভা সংক্ষেপে সৌরপ্রভা। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়ে সৌরপ্রভা ভালভাবে দেখা যায়।

---

28 পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

নিয়ন (Ne), আরগন (Ar) ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি সাধারণতঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। তার কারণ এদের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসে শেষ কক্ষে 8টি করে electron বর্তমান। তাই অন্যান্য মৌলের পরমাণুগুলি শেষ কক্ষের ইলেকট্রন গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করবার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকে এবং এই প্রক্রিয়া তিনটি বিভিন্ন উপায়ে যথাক্রমে by electrovalency, by covalency এবং by co-ordinate covalency-র মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তা হলে এর ফলে তিনজাতীয় বিভিন্ন যৌগ যথাক্রমে Electrovalent compound, covalent compound এবং Co-ordinate covalent compound উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। Covalent compound এর বেলায় দুটো পরমাণুর শেষ কক্ষের ইলেকট্রনের আদান-প্রদানের মাধ্যমে দুটো পরমাণুর মধ্যে মিলনের যোগসূত্রটি স্থাপিত হয় ইলেকট্রন-যুগল তৈরি করে যা যোজ্যতা বন্ধনী বা valency bond-এর কাজ করে এবং এজাতীয় যোজ্যতা-কে বলা হয় সমযোজ্যতা বা covalency আর এর দ্বারা উৎপন্ন নতুন যৌগটিকে বলা হয় covalent compound। সাধারণ তাপমাত্রায় সিলিকন বা জার্মেনিয়াম কৃস্টালে নিজ নিজ পরমাণুগুলির মধ্যে covalent bond তৈরি করে বসবাস করে। পরমশূন্য তাপমাত্রায় (absolute temperature অর্থাৎ $-273°C$) সম্পূর্ণ খাঁটি জার্মেনিয়াম এবং সিলিকন অন্তরকের মত ব্যবহার করে। তাই এর সঙ্গে কিছু খাদ বা doping material মিশিয়ে semiconductor বা অর্দ্ধ-পরিবাহকের কাজে লাগানো হয়।

---

17 যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা কলকাতা-61

কয়েক দিনের অতিথি

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়ার পাহাড়ে জঙ্গলে টো টো করে বেড়াই ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজে। ক্যাম্প থেকে সকালে বেরোই ফিরে আসতে আসতে বিকেল। জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে পরীক্ষা করে দেখি পাথরের চেহারা, প্রকৃতি, দোষগুণ সবকিছু। তারপর হিসেব করতে বসি, পাথর থেকে দামী খনিজ কিছু পাওয়া যাবে কিনা। পেলেও কতখানি। কোন পাথর থেকে নতুন কোন খনিজ পাওয়ার সম্ভবনা দেখা দিলে মনটা খুশি খুশি লাগে, আবার উলটোটা হলে আসে হতাশা।

সেদিন সারা সকাল পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, নতুন কোন খনিজের সন্ধান মেলে নি। দুপুর বারোটা নাগাদ রোজকার মতো একটা বড় পাথরের চাতালে মহুয়া গাছের নিচে হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় নজরে এলো, একটু দূরে আরেকটা পাথরের চাতালের ওপর ঘুমিয়ে আছে একটি ছেলে। ছেলেটির বয়স বেশি নয়, পনেরোর কাছাকাছি হবে হয়তো। সুন্দর ভদ্র চেহারা। এখানে এই জঙ্গলে পাহাড়ে এইরকম একটি ঘুমন্ত ছেলেকে দেখে খুবই অবাক হলাম। নির্লিপ্ত থাকব ভেবেও চুপচাপ বসে থাকতে পারলাম না। পাথরের চাতাল থেকে নেমে ছেলেটির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু ছেলেটি তখনো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। ছেলেটির নাকের কাছে হাত রেখে দেখলাম। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি খুবই মন্থর, ঝট করে বোঝা যায় না। মাথায় হাত রেখে দেখলাম, শরীরটাও যেন একটু বেশি ঠাণ্ডা। তবে কি কোন দুর্ঘটনায় পড়ে ছেলেটি ধুঁকছে। এক্ষুনি হয়তো চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ডাক্তার পাব কোথায় ? কারণ এই পাথুরে জায়গায় পঁচিশ তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে কোন পাশ করা ডিগ্রীধারী ডাক্তারের দেখা মিলবে না। ছেলেটিকে বাঁচাতে হলে জিপে চাপিয়ে পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এক্ষুনি। আমার জিপ অবশ্য কাছেই একটা বটগাছের নিচে রাখা আছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না ভেবে ছেলেটিকে পাঁজাকোলা করতে গেছি, এমন সময় চোখ মেলে তাকাল ছেলেটি। ওর চোখে ভয়ের চিহ্ন, সংশয়ের আভাস।

এমনিতে ছেলেটির চেহারা ভালো, ফরসা, কালো চুল। তবে চোখের মণিটা পুরোপুরি সবুজ রংয়ের। এরকম সবুজ চোখ আগে কখনো দেখি নি।

ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম। 'কী নাম তোমার ? কোথা থেকে এসেছ ?' উত্তরে ছেলেটি কিছুই বলল না। শুধু বিস্মিত দু'চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তবে এই দু'তিন মিনিটে ওর চোখমুখ থেকে ভয়ের ভাবও খানিকটা কমেছে। মনে হলো ছেলেটি হয়তো ইংরেজি জানে না। তাই ইঙ্গিতে অঙ্গভঙ্গী করে জানতে চাইলাম ওর নাম আর বাড়ির ঠিকানা।

কিন্তু এবারো ছেলেটি ওর নাম বলল না। হালকা অস্পষ্ট উচ্চারণে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। কোন সংখ্যা নাকি আর কিছু।

এবার তাকে হাত দিয়ে ভঙ্গী করে ওঠবার জন্য বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠল ছেলেটি। কিছুক্ষণ আগের দুর্বল ভাবটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

জিপে চেপে ক্যামপে ফিরতে হাতমুখ নাড়িয়ে সামান্য কিছু কথাবার্তা হলো। কিন্তু ভাষার অসুবিধের জন্য বেশিক্ষণ কথাবার্তা চালানো গেল না। দেখলাম ছেলেটি আমার জানা কোন ভাষাই জানে না। তবে আরবিক সংখ্যাগুলো জানে দেখলাম।

জিপে বসে থাকতে থাকতে ভাবছিলাম, ছেলেটি কোন দেশের কে জানে। চেহারা দেখে একবার মনে হলো, দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশের হলেও হতে পারে। কিন্তু ওসব দেশের কোন ভাষাই তো আমার জানা নেই। তাই ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা দেখছি অঙ্গভঙ্গীতেই চলাতে হবে। তবে একটা কথা মগজে কিছুতেই ঢুকছিল না, ছেলেটি দক্ষিণ আমেরিকার মতো সুদূর দেশ থেকে পুরুলিয়ার এই জঙ্গল পাহাড়ে পৌঁছল কী করে ? সেটা কি সম্ভব !

ছেলেটি ক্যামপে আমার সঙ্গেই থাকে। ওর জন্য একটা ফোলডিং খাট কিনেছি। তাতেই শোয়। জঙ্গলে পাহাড়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াই. তবু আমার একমাত্র চিন্তা কী করে ওকে বাপ-মার কাছে ফিরিয়ে দেব। ওকে মঙ্গলবার অর্থাৎ টুইসডেতে পেয়েছিলাম বলে ওর নাম রেখেছি টুইস। এই নতুন নামকরণে ও খুবই খুশি কারণ নিজের আসল নামটা নাকি ওর কিছুতেই মনে পড়ছে না।

আমার মনে হলো টুইসের বোধহয় স্মৃতিভ্রংশ অসুখ হয়েছে। হয়তো এই অসুখের ফলে নিজের বাপ-মা, ভাই-বোন, বাড়ি, ভাষার বোধ—সবকিছুই লুপ্ত হয়েছে ওর স্মৃতি থেকে। তাই টুইসকে নতুন করে সবকিছু শেখাতে শুরু করলাম। কাউকে নতুন ভাষা শেখানো তো সহজ কাজ নয়। কিন্তু টুইসের মগজ খুবই পরিষ্কার। যে কোন জিনিসই ঝটপট শিখে নেয়। তাই দিন পনেরোর মধ্যেই কাজ চালানোর মতো ইংরেজি-বাংলা শিখে নিল। অবশ্য শুধু ভাষা নয়, আমার সঙ্গে টুইস প্রতিদিন জঙ্গলে পাহাড়েও ঘুরে বেড়ায়, পাথর ও খনিজ দেখে, চেনে। আমার সঙ্গে থেকে মানচিত্র সংক্রান্ত আরো অনেক কিছুই শিখে নিল।

টুইসের বুদ্ধি ওর বয়েসী যে কোন ছেলের চেয়েই বেশি। ও তাই খনিজ অনুসন্ধানের কাজকর্ম খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিল। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে এ বিষয়ে ওর জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা শুনে বেশ অবাক হয়ে যেতাম। তাছাড়া কিছু দিনের মধ্যেই আমি অনুভব করতে শুরু করলাম। টুইসের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রয়েছে যা ওকে এক বিরল ক্ষমতা দিয়েছে।

একদিন বিকেলে পাহাড়ী রাস্তা ধরে ক্যামপের দিকে আমরা দু'জন হেঁটে ফিরছি। চারিদিক নির্জন, পায়ে চলা রাস্তায় লোকজন বিশেষ নেই। মাঝে মাঝে কেবল দু'একজন কাঠুরের দেখা মেলে। পাহাড়ী রাস্তার ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার এক পুরনো অভিজ্ঞতার গল্প বলছিলাম টুইসকে। আমরা দুজনেই তখন গল্পে এমন মশগুল যে আশেপাশের কোন কিছুই আমাদের তেমন নজরে পড়ছিল না।

কিন্তু কি যে হলো, গল্পের মাঝখানে হঠাৎ আমাকে টুইস এমন জোরে হ্যাঁচকা টান মারল যে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম একটা বড় গাছের ওপর। রাগ ও বিরক্তিতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'একি ব্যাপার—'। কিন্তু আর কিছু বলবার আগেই ভয়ার্ত চোখে দেখলাম, ঠিক তক্ষুনি একটি বিরাট পাথরের বোলডার পাহাড়ের মাথা থেকে ভেঙ্গে পড়ল ঠিক সেই জায়গাটায় যেখানে এই একটু আগেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। কী হতে পারত একথা ভেবে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে জড়িয়ে ধরলাম টুইসকে, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ তুমি। কী করে যে তোমার এই ঋণ শোধ করব টুইস !'

নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল টুইস, 'আমার কাজ আমি করেছি, এর মধ্যে আবার কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন কোথায়। এ ধরনের ব্যাপার আমি আগে থেকেই বুঝতে পারি। তাই তো পাথর ভেঙ্গে পড়বে বুঝতে পেরেই আপনার হাত ধরে টেনেছিলাম—'

'কিন্তু তুমি তো কোন শব্দ শুনতে পাও নি—'

'তা' ঠিক, শব্দ নয় পাথর ভেঙ্গে পড়বার আগে বাতাসে এক ধরনের মৃদু কম্পন হয়, যা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি, কিন্তু আপনারা পারেন না—'

'তার মানে ?—অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'তার মানে কিছু নেই।' আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে টুইস। ওর চোখের সবুজ মণি এক আশ্চর্য দীপ্তিতে ঝকঝক করতে থাকে। ওকে ঘিরে আজ কী যেন এক রহস্য !

ওর চোখের সবুজ মণি দেখে আজ একটা নতুন সন্দেহ আমার মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে। ওর দিকে এই প্রথম তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে তাকাই। ওর দু'হাত ধরে বলি 'সত্যি করে বলো - তুমি কে ! তুমি কি আমাদের মতো মানুষ নও। তোমার পরিচয় আজ দিতেই হবে।'

শেষ বিকেলের আলোয় পশ্চিম আকাশ লালে লাল। সেদিকে বিষণ্ন করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল টুইস, 'সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। চলুন কোথাও বসি।'

সামনেই একটা বড় পাথরের চাঁই। তারই ওপর বসলাম দু'জনে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে টুইস বলতে শুরু করল, 'সৃজনদা আপনার কাছে কিছুই আর লুকিয়ে রাখব না। এতদিন আপনাকে ভুল বুঝিয়েছিলাম। আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়নি, সবই মনে আছে। তবে ভয় আর সংকোচের জন্য বলতে পারি নি। আপনি শুনে অবাক হবেন, এই পৃথিবীর আমি কেউ নই। আমি এসেছি ভিনগ্রহ থেকে আমাদের গ্রহ আপনাদের পৃথিবী গ্রহ থেকে বহু দূরে....অনেক কোটি মাইলের পথ—'

নীরব থেকে টুইস বলতে শুরু করলো…

টুইসের কথা শুনে আমি তো অবাক। সত্যি সত্যিই যে টুইস ভিনগ্রহের বাসিন্দা সেকথা কখনোই মনে প্রাণে বিশ্বাস করি নি, কেবল সন্দেহ হয়েছিল মাত্র।

টুইস বলে চলে, 'আমাদের গ্রহের লোক সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে সরকার পরিবার পিছু লোক সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে। বাবা-মা-ভাই বোন মিলে আমাদের পরিবারে লোকের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তাই পরিবারের লোক-সংখ্যা সীমিত রাখবার জন্য আমাদের গ্রহ ছেড়ে আমাকে চলে আসতে হলো পৃথিবীতে। অবশ্য আমাকে রাখবার বিনিময়ে আমার বাবা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। সরকারকে সবকিছু জানিয়ে অনুমতিপত্রও আনিয়াছিলেন, কিন্তু আমিই বাবাকে আত্মহত্যা করতে দিই নি—'

কথা বলতে বলতে টুইসের চোখ ছলছল করতে থাকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে নিজের চোখটা মুছে নেয় একবার, তারপর আবার বলতে শুরু করে, 'পৃথিবীতে থাকতে আমার বেশ ভালোই লাগছে। পৃথিবী কত সবুজ প্রাণবন্ত। এখানে কত গাছপালা নদীনালা। কিন্তু আমার আর এখানে থাকা হবে না। কাল বিকেলে বেরিয়ে সিগ-ন্যালে খবর পেয়েছি, আমি চলে আসবার পরেই আমার বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন আর গতকালই উনি মারা গেছেন—'

টুইসের কথা শেষ হয়ে যাবার পরেও আমরা দুজনেই নীরব হয়ে বসে থাকি অনেকক্ষণ। ওকে ফিরতে হবে নিজের গ্রহে নিজের বাড়িতে। কেমন করে তা' অবশ্য ওই জানে' আমার কোন ধারণাই নেই।

করুণ স্বরে বলতে শুরু করে টুইস, অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরব ভেবে বেশ ভালো লাগছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে যে বাবাকে দেখতে পাব না সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে দুঃখের—'

'কী আর করবে বলো—'সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি টুইসকে।

একদিন বিকেলে কাজ থেকে ফিরে দেখি টুইস নেই। রওনা হয়েছে নিজের গ্রহের পথে। আমার জন্য রেখে গেছে একটা চিঠি।

প্রিয় সৃজনদা,

ফিরে চললাম নিজের গ্রহে। এক্ষুনি ফিরতে হবে, না হলে হয়তো কোনদিনই আর ফিরতে পারব না। মায়ের কাছ থেকে খবর পেয়েছি গ্রহের অবস্থা ভালো নয়। যে কোন মুহূর্তে পরিবার পিছু সর্বোচ্চ লোকের সংখ্যা আরো কমিয়ে দেওয়া হতে পারে। তাই ফিরছি। জানি না আবার পৃথিবীতে ফিরতে হবে কিনা।

আপনার প্রীতি ও ভালোবাসা বহুদিন আমার মনে থাকবে, গুড বাই। ইতি— **টুইস**

টুইস চলে গেছে। জানি না আবার দেখা হবে কিনা।

B4/2 Iswarchndra Nibas 68/1 Bagmari Road, Calcutta-700054

"জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়। প্রভুত্ব নয় প্রবলতা নয়— বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়—ছোট বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করবো।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(বিশ্ববোধ : শান্তিনিকেতন ২)

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

BEEVAS/ICA/871

রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি : রামকিঙ্কর

এগারো ঃ নরবানরদের বর্ধিত সম্মেলন

সাগরেদদের মধ্যেই বসে থাকা উচিত জিরা-র। কিন্তু দেখতে পেলাম না তাকে। ওর চোখে চোখে চাইলেও মনে বল পেতাম সেই মুহূর্তে। কিন্তু নারকীয় নর-বানর সমাবেশে পরিচিত মুখ একটাও দেখতে না পেয়ে আশাহত হলাম খুবই।

কাজেই চোখ ফেরালাম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের দিকে। প্রত্যেকেই বসে লাল কাপড় দিয়ে মোড়া হাতলওয়ালা চেয়ারে। বাকি সবার জন্য বরাদ্দ টুল কিংবা বেঞ্চি। এদেরকে দেখেই জেয়াসের চেহারা মনে পড়ল বড় বেশি করে। প্রায় একই রকম আকৃতি আর দেমাকি চালচলন। মাথা ঝুঁকে রয়েছে বুকের ওপর। লম্বা একখানা হাত বাড়িয়ে কোলের ওপর রাখা খোলা নোট বইয়ে মাঝে মাঝে টুকটাক পয়েন্ট লিখছে। সত্যিই লিখছে কি ছেলেমানুষের মত অর্থহীন আঁকিবুঁকি কাটছে, তা বোঝার উপায় নেই। পেছনে ওপরের দিকের উত্তেজনার তুলনায় এরা একেবারেই নির্বিকার। আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লাউডস্পীকারে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকরা তা শুনেওছিল। কিন্তু ঔদাসীন্য ঘোচেনি। তিনজন ওরাংওটাংকেই কেবল একটু চমকে উঠতে দেখেছিলাম। সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে যেন গভীর ঘুম তাড়িয়ে সজাগ হবার চেষ্টা করেছিল।

চেষ্টাই করেছিল—ঢুলুঢুলু চাহনি যায়নি পুরোপুরি। অথচ হাজার হাজার নরবানরদের উত্তেজনা মাখা চোখের চাহনি আমার দিকেই নিবদ্ধ রয়েছে দেখে বেশ বুঝেছিলাম আজকের অনুষ্ঠানে কত বড় আকর্ষণ আমি।

রক্ষীরা আমাকে ঠেলে তুলে দিল মঞ্চের ওপর। নজর কেড়ে নেওয়ার মত বিরাটাকার একজন গরিলা বসেছিল সেখানে। জিরার কাছে আগেই শুনেছিলাম সম্মেলনের সভাপতি হয়েছে একজন সংগঠক—কোনো বৈজ্ঞানিক নয়। কেন না, নরবানর বৈজ্ঞানিকরা জ্ঞানগর্ভ বাদানুবাদেই মশগুল থাকে নিরন্তর—সিদ্ধান্ত কি হল না হল, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বিশালদেহী এই গরিলার বাঁদিকে বসে একজন শিম্পাঞ্জী সেক্রেটারী—যে যা বলছে হুবহু তাই টুকে নিচ্ছে। ডানদিকে বসে একজন বৈজ্ঞানিক। মঞ্চে যাকে ডাকা হয়েছে এমন বৈজ্ঞানিক। বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত হচ্ছে।

এই মুহূর্তে সেই আসনে বসে জেয়াস। বসবার আগে হাততালি পড়েছিল নিশ্চয়, এখনও তার রেশ মিলোয়নি। বেশ কয়েকটা লাউডস্পীকার আর প্রোজেক্টরের দৌলতে মঞ্চের প্রতিটি দৃশ্য অ্যাম্ফিথিয়েটারের দূরতম অংশ থেকেও স্পষ্ট দেখবার এবং শোনবার ব্যবস্থা করে রেখেছে সম্মেলন সংগঠকরা।

সভাপতি গরিলা ঘন্টাধ্বনি করতেই নিশ্চুপ হয়ে গেল সম্মেলন কক্ষ। মহামান্য জেয়াস এবার বক্তৃতা দেবে—শোনা গেল তার ঘোষণাতেই। জেয়াস যে বিচিত্র মানুষটা সম্বন্ধে এতক্ষণ অনেক কথা বলে গেছে, এবার তাকে আনা হয়েছে মঞ্চের ওপর।

সভাপতির ভাষণ শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল ওরাংওটাং জেয়াস। শুরু করল বক্তৃতা। আমি যদ্দূর সম্ভব বুদ্ধিমানের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার প্রসঙ্গ উঠতেই বাতাসে মাথা ঠুকে, বুকে এক হাত রেখে সম্মান জানাতেই হাসির হররা উঠলসম্মেলন কক্ষে—ঘন্টাধ্বনি হতেই আবার সব চুপ। সঙ্গে

সঙ্গে বুঝলাম, এই ধরনের কৌশল দেখিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না। প্রশিক্ষণ পেলে সব মানুষই এমন কায়দা দেখাতে পারে, এই ধারণাই করে বসবে নরবানররা। তার চাইতে বরং চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যাক। ভাষণ শেষ হোক। আমার পালা আসুক। আক্কেল গুড়ুম করে দেওয়া যাবে বাছাধনদের।

প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার শুনিয়ে মঞ্চে রাখা যন্ত্রপাতি-গুলো সবাইকে দেখাল জেয়াস—জঘন্য এইসব যন্ত্রপাতি দিয়েই এবার আমার কৌশলের দৌড় পরীক্ষা করা হবে। শেষ কথায় জানাল, পাখিরা যেমন শেখানো বুলি কপচাতে পারে, আমিও তেমনি দু'চারটে বুকনি আওড়াতে পারি। সবাইকে এখুনি তা শোনানো হবে।

বলে, অসংখ্য তার আর দড়ি বাঁধা বাক্সটা তুলে নিয়ে আমার হাতে দিল জেয়াস। বাঁধন খুলে তালা খসানোর খেলা দেখাতে হবে বুঝলাম।

কিন্তু তা করলাম না। সময় এসেছে আমি যে আসলে কে, তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেওয়ার। সটান গিয়ে দাঁড়ালাম মাইক্রোফোনের সামনে। সম্বোধন করলাম সভাপতি মশায়কে।

বলে গেলাম নরবানরদের ভাষায়—"শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, এ বাক্স এখুনি খুলে দেব। আরও যা যা খেলা দেখাতে বলবেন, সবই সানন্দে দেখাব। কিন্তু তার আগে অনুমতি দিন আমাকে কিছু কথা বলার। সে কথা এমনই কথা যে তাজ্জব হয়ে যাবেন উপস্থিত সুধীবৃন্দ।"

সুস্পষ্টভাবে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করেছিলাম বলেই তা গেঁথে গেল প্রত্যেকের মনের মধ্যে। ফলটা যে রকম আশা করেছিলাম। হল ঠিক তাই। বোবা বিস্ময়ে নিরুদ্ধনিঃশ্বাসে চেয়ারে কাঠের পুতুলের মত বসে রইল প্রতিটি নরবানর। পয়েন্ট লিখতে ভুলে গেল সাংবাদিকরা। ঐতিহাসিক এই মুহূর্তকে ক্যামেরায় ধরে রাখতে বিস্মৃত হল ফটোগ্রাফাররা। স্তম্ভিত হওয়া যাকে বলে—ঠিক তাই।

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল সভাপতি মশায়ের। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়েছিল আমার দিকে। রেগে টং হয়ে গেল কিন্তু জেয়াস।

বললে বিচ্ছিরি রকমের চিৎকার করে—"মিঃ প্রেসিডেণ্ট। প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি........"

ঐ পর্যন্ত বলেই থেমে গেল জেয়াস। সামান্য একটা মানুষের সঙ্গে টক্করে নামা যে শোভন নয় এবং রীতিমত হাস্যকর, তা খেয়াল হতেই চুপ মেরে গেল একেবারেই। সুযোগটাকে কাজে লাগালাম তৎক্ষণাৎ। চালিয়ে গেলাম বক্তৃতা।

"মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আত্মবিশ্বাস নিয়ে আবার বলছি, আপনার প্রতি অবিচল রয়েছে আমার শ্রদ্ধা। কিন্তু আমাকে কথা বলার সুযোগ দিন। আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। কথা দিচ্ছি, আমার যা বলবার, তা শেষ হলেই অতি মহামান্য জেয়াসের প্রতিটি হুকুম শুনে যাব অক্ষরে অক্ষরে।"

ক্ষণেকের নৈঃশব্দের পরেই যেন হারিকেন ঝড় বয়ে গেল সম্মেলন কক্ষে। মত্ত প্রভঞ্জনের প্রলয়লীলায় যেন উন্মত্ত হয়ে গেল চেয়ারে আসীন প্রতিটি নরবানর। হাততালি, ফুঁপিয়ে কান্না, জয়োল্লাসের সঙ্গে মিলেমিশে গেল নিরন্তর ম্যাগনে-সিয়ামের ঝলক। অবশেষে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে ফটো-গ্রাফাররা। অসাড় প্রত্যঙ্গগুলোয় সাড় ফিরেছে। পুরো পাঁচ মিনিট ধরে চলল তুমুল হট্টগোল। অ্যাম্ফিথিয়েটার ফেটে চৌচির হয়ে যায় আর কি! এই পাঁচটা মিনিট কিন্তু ঠায় আমার দিকেই চেয়ে থেকেছে সভাপতি—চোখ সরায়নি একবারও। সামলেও নিয়েছে নিজেকে। তাই আর দেরি হল না সিদ্ধান্ত নিতে। ঘণ্টাধ্বনি করল সজোরে।

তোৎলামি শুরু হয়ে গেল কিন্তু কথা বলতে গিয়ে—"তো-তোমাকে কিভাবেই সম্বোধন করব ভেবে পাচ্ছি না।"

"শুধু মঁসিয়ে বলুন," বললাম আমি।

"ইয়ে....তা ঠিক ..মঁসিয়ে অসাধারণ পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে...এ পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তোমাকে অনুমতি না দিয়ে পারছি না। বলো, কি বলতে চাও?"

আর একদফা হাততালি প্লাবনের মত যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল সভাপতির বাকি কথাগুলো। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি মঞ্চের ঠিক মাঝখানে, মাইক্রোফোনের সামনে। মাউথপিসটা ঘুরিয়ে নিলাম নিজের দিকে। তারপর যা বললাম, তা এই:

"পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি, "মাননীয় গরিলাগণ, "বিদগ্ধ ওরাংওটাংগণ, "বিজ্ঞ শিম্পাঞ্জীগণ, "হে নরবানররা!

"আমি একজন মানুষ, আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

"আমি জানি আমায় দেখতে কিম্ভূতকিমাকার, আমার আকৃতি কদাকার, আমার চোখমুখ পশুর মত, আমার গায়ের গন্ধে আপনাদের গা পাক দেয়, আমার চামড়ার রঙ দেখলে আপনাদের পিত্তি জ্বলে যায়। আমার এই হাস্যকর কদাকার অবয়ব আপনাদের মেজাজ খিঁচড়ে দেয় জানি, কিন্তু এটাও জানি যে আজ এই শুভ মুহূর্তে যাঁদের সামনে আমার বক্তব্য রাখবার সুযোগ পেয়েছি তাঁদের সঙ্গে তুলনীয় জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এবং বিদগ্ধতম নরবানর এই দুনিয়ায় আর নেই, আমি জানি আপনারা বিলক্ষণ উন্নত মনের অধিকারী এবং চোখ-কান-নাক-জিভ-চামড়া—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নগণ্য অভিজ্ঞতা দিয়ে কাউকে বিচার করেন না, জঘন্য এই বাহ্যিক খোলসের সারবস্তুটাই যে আপনাদের মনের ঊর্ধ্বস্তরে বিচারের পট-ভূমিকা সৃষ্টি করে....."

এই ধরনের বাগাড়ম্বর আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল কর্নেলিয়াস আর জিরা। ওরাংওটাংদের মন গলাতে হলে

নাকি এই জাতীয় বাক্য আর উচ্ছ্বাস একান্তই দরকার। ভনিতা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। অতবড় অ্যাম্ফিথিয়েটার একেবারে নিশ্চুপ—ছুঁচ পড়লেও যেন আওয়াজটা শোনা যাবে। দম আটকে বসে হাজার হাজার নরবানর।

"হে নরবানরগণ! মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। বিশ্বাস করুন, সত্যিই কথা বলতে পারি আমি—তোতাপাখির মত শুধু বুলি কপচাই না। আমি ভাবতে পারি এবং সেই ভাবনাকে কথায় প্রকাশ করতে পারি। আপনারা যা বলেন, তা বুঝতে পারি এবং আপনাদেরকেও বোঝাতে পারি। পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় একটু পরে যদি জেরা শুরু করতে মনস্থ করেন, আপনাদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করব।

"কিন্তু তার আগে চমকপ্রদ খবরটা আপনাদেয় জানিয়ে রাখতে চাই। শুধু খবর নয়—মহাসত্য। আমি শুধু যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীই নই, মানুষের এই কলেবরের মধ্যে অতি উন্নত মনের অধিকারীই নই—আমি এসেছি বহুদূরের এক গ্রহ থেকে। সে গ্রহের নাম পৃথিবী। প্রকৃতির খেয়ালে এই পৃথিবীতেই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব—জ্ঞানবিজ্ঞান, যুক্তি-বুদ্ধির দৌলতে। কোত্থেকে এসেছি, তা বললাম শুধু মহামান্য ডাক্তারদের অবগতির জন্যেই নয় ঐতো ওঁরা বসে রয়েছেন আমার চারপাশে—কিন্তু আজকের এই সম্মেলনে যাঁরা এসেছেন, যাঁরা হয়ত জানেন না সৌরজগতের কোথায় কোন গ্রহ আছে—তাঁদেরও অবগতির জন্যেও বটে।"

লম্বা লম্বা পা ফেলে গেলাম ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে। চক খড়ি দিয়ে নক্শা এঁকে দেখিয়ে দিলাম সৌরজগতের

দুহাতে তালি বাজিয়ে চকখড়ির গুঁড়ো ঝাড়তেই…

চেহারা। দেখিয়ে দিলাম ছায়াপথের কোথায় রয়েছে সূর্য আর তার চারপাশের গ্রহগুলো। কারও মুখে টুঁ শব্দটিও শোনা গেল না—নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে গিলে গেল আমার এই গৌরচন্দ্রিকাটাও। ছবি আঁকা শেষ করে চকখড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুহাতে তালি বাজিয়ে খড়ি গুঁড়ো ঝাড়তেই উল্লাসের গুঞ্জন শুনলাম হাজার হাজার নরবানরের কণ্ঠে। অভিজ্ঞ প্রফেসররাই এইভাবে খড়ির গুঁড়ো ঝাড়েন হাত থেকে—দৃশ্যটা মনে দাগ কেটে গেছে প্রত্যেকেরই।

ঘুরে দাঁড়ালাম জনগণের দিকে। বললাম—এই পৃথিবী-তেই মানুষ জাতটাই একমাত্র মন নামক বস্তুর অধিকারী। এটা একটা ঘটনা এবং এতে আমার কোনো হাত নেই। এই গ্রহে পা দেওয়ার পর বিষম বিচলিত হয়েছিলাম সেই কারণেই। কেন না, পৃথিবীতে বানররাই রয়ে গেছে এখন বর্বরের পর্যায়ে। মানুষদের করোটির মধ্যেই মগজ বেড়েছে, জ্ঞানবিজ্ঞান সভ্যতাকে পৃথিবীতে বিস্তার করেছে। মানুষই ভাষা আবিষ্কার করেছে, আগুন আবিষ্কার করেছে, কাজের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে। পৃথিবী গ্রহের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে এই মানুষ জাতটাই উন্নত সেই সভ্যতার সঙ্গে অনেক দিক দিয়ে মিল রয়েছে আপনাদের এই সভ্যতার।"

এই জায়গায় কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলাম আমাদের কীর্তি-কলাপের। বর্ণনা দিলাম বড় বড় শহরগুলোর, কলকারখানার যানবাহন ব্যবস্থার, দেশ শাসন ব্যবস্থার, আইনকানুনের, আমোদ-প্রমোদের। তারপর আরও বিশদভাবে বলে গেলাম বিজ্ঞান আর চারুশিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনে আমাদের বিবিধ অগ্রগতির কাহিনী। কথা বলতে বলতে আপনা থেকেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠল আমার গলার আওয়াজ। বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক নিজের সম্পত্তির হিসেব দেওয়ার সময়ে যেমন গরিমাদৃপ্ত এবং অহঙ্কারমত্ত হয়ে ওঠে, আমার অবস্থাও হল প্রায় সেইরকম। পৃথিবীর কথা বলতে কার না ভাল লাগে—বিশেষ করে একপাল নিকৃষ্ট বাঁদরের সামনে।

পরিশেষে এলাম আমার সুমহান অ্যাডভেঞ্চার পর্বে। গুছিয়ে বলে গেলাম কিভাবে কি ধরনের মহাকাশযানে চেপে পৃথিবী ছেড়ে এসেছিলাম সোরোর গ্রহে, ধরা পড়ার পর খাঁচায় বন্দী হয়েছিলাম কিভাবে, জেয়াসের সঙ্গে মত বিনিময় করার চেষ্টা করেছিলাম কিভাবে এবং নিজের দোষেই ব্যর্থ হয়েছিলাম কিভাবে। শেষকালে সফল হয়েছিলাম জিরার আগ্রহ আমাকে ঘিরে গড়ে ওঠায়। পরিচিত হয়েছিলাম ডক্টর কর্নেলিয়াসের সঙ্গে। ভাষণ শেষ করলাম এইভাবে।

[চলবে]

ছড়া

এক : ডিনামাইট

মিষ্টি কোন গুড় নয়,
নাম কিজেল গুড়,
'নাইট্রোগ্লিসারিণ' শুষে—
নেশাতেই চুর।
বিস্ফোরকটি আসে বুঝি
পারো তাকে মানতে ?
'ডিনামাইট নাম শুনে
সবে থাকে আতঙ্কে।

দুই : মৃদু ও তীব্র অ্যাসিড

জলেতে অ্যাসিড যবে
আয়ণিত হয়—
প্রোটনও কম বেশী
পাইবে নিশ্চয়।
কম হলে অ্যাসিডের
মৃদু নাম হয়,
বেশিতে আর বুঝি
তীব্র নাম লয়।

কমল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা।

কলাগাছ ভেষজ উদ্ভিদ

মুরারিমোহন ভট্টাচার্য

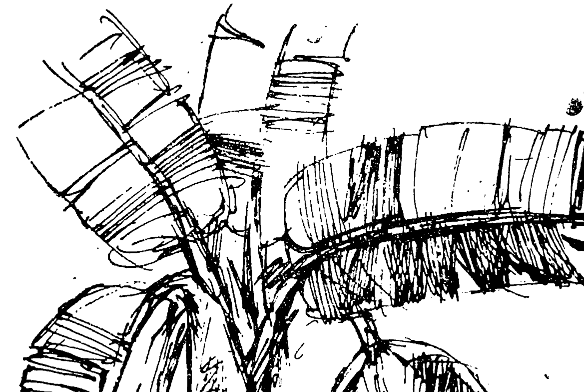

কলাগাছ খুব নরম ও রসালো। লম্বায় 7-8 ফুট উঁচু আবার 4 ফুটও দেখা যায়। কলাগাছের জন্ম হ'ল সূদুর "মার্ত্তা বান" দ্বীপে, লম্বা ডাঁটা সমেত পাতা, পাতা সবুজ ও চওড়া। পাঁচ সাতটা পাতা সমেত একটা সম্পূর্ণ গাছ। গাছটা কতকগুলি পেটো বা বল্কল দিয়ে গ্রথিত। ফলে সহজে ঐ গ্যাছ থেকে কোন প্রকারে দেহাংশ খুলে ফেলা যাবেনা—এটাই প্রকৃতি দেবীর বিচিত্র রহস্য। তবে এও দেখেছি কলাগাছের পেটোর উপর পেটোগুলি চক্রাকারে সাজানো আছে একেবারে মূল থেকে এটাই ঐ গাছের বিশেষত্ব। অন্যান্য গাছের ভিতর আছে Solidity অর্থাৎ সার। তা কলাগাছের Solidity ও আছে তার নাম "থোর"।

কলাগাছের শুকনা পাতা ও পেটো কে বলে কলা "বাস্‌না"। সহসা এ গাছের মৃত্যু হয়না। এ গাছের মৃত্যু ঘটায় কাল ও সাদা দু ধরনের বিষাক্ত পোকা—তাই বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের মাঝা মাঝি বসানো বিধেয় ঐ সময়ে গাছের গোড়ার মাটি আঙ্গা থাকে এবং পোকা মাকড় ও অনেক নিচে চলে যায় তোলাও সুবিধা হয়। কলাগাছের পাশ থেকে যে ছোট গাছ বের হয় তাকে পোয়া বা তেউর বলে। কলা তেউর সদ্য তুলেই বসাতে নেই কমপক্ষে এক সপ্তাহ কাল কোন ছাওয়া যুক্ত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়—সময় অতীত হলে পাঁচ হাত অন্তর 1 ফুট গর্ত করে গোড়াটাকে ধুয়ে চূন মাখিয়ে বসাতে হয়। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে গাছের গোড়া থেকে নতুন গাছের আবির্ভাব হয়। সাধারণতঃ দোআঁশ মাটিতে ঐ গাছ ভাল হয় তবে ফেলা মাটিতে বা চূণ সুড়কী যুক্ত মাটিতে খুব তেজী গাছ হয় ও কলাও পুষ্ট হয়। কলাগাছ সাধারণতঃ ফাঁকা রৌদ্র যুক্ত জায়গায় সারি দিয়ে বসাতে হয় এবং গোড়ার উঁচু করে মাটির ভুতো দিতে হয়। কলা গাছের পাতা কাটা নিষিদ্ধ, এতে গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং কলা ধরলেও পুষ্ট হয় না, একারণেই পাতা কাটা নিষিদ্ধ। কলাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) বিদ্যমান। এতে যথেষ্ট Calcium iron এবং অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। কলা একটা Compound fruit বা যৌগ ফল। কলার ফুলকে "মোচা" বা Plantain flowers বলে বা ডায়াবিটিস্ রোগীর পক্ষে উপকারক। কলা গাছের মূলকে "এঁটে" বলে ঐ এঁটে থেকেই যত রোগের সৃষ্টি—গাছ তোলবার সময় দেখতে হবে গোড়ায় কোন কালো দাগ [চক্রকারে

আছে কিনা বা পরে ধরেছে কিনা তখনই বুঝতে হবে গাছটা রোগগ্রস্ত গাছ। কালো কালো গুবরে পোকার মত পোকা কলা গাছের পেটোর মধ্যে বাসা বাঁধে, পেটো ফাটে আর ঐ মিষ্ট রস খায় এবং গাছের মধ্যে ক্ষতের সৃষ্টি করে আর ঐ ক্ষত স্থান দিয়ে স্বচ্ছ গঁদ আঠার মত গাছের রস ঘনীভূত অবস্থায় বেরিয়ে আসে এবং গাছটা ক্রমশ মরে যায়। কলা গাছকে "ওষধি" গাছ বলে কারণ একবার ফলদান করে মারা যায় বলে। কলা কাটার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাছের গোড়া তুলে ফেলতে হবে নচেৎ গোড়া পচে সমগ্র বাসাড়কে নষ্ট করে দেবে। সাবধানতাই কলা গাছ রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

আমাদের দেশে। 3।4 রকমের কলা দেখা যায়—কাঁচকলা বা কাঁচা কলা, চাঁপা কলা, মর্ত্তবান কলা। বেশ আগে কানাই বাঁশি কলা বলে একজাতীয় কলা দেখা যেত, আজ কাল তা মেলেনা বাজারে যে সবুজ রঙের কলা ব্যাপক বিক্রী হয় এ অবশ্য বাংলার নিজেস্ব সম্পদ নয়—এটা ভারতের মধ্য প্রদেশের ভূসওয়াল নামক স্থানে ব্যাপক ভাবে চাষ হচ্ছে।

এজাতীয় চাষ বাংলা দেশেও স্থান পেয়েছে এবং বাজারের চাহিদা মেটাচ্ছে। বাংলা দেশের মধ্যে হুগলী জেলার সিঙ্গুর: নালিকূল, চন্দননগর ও হুগলী সংলগ্ন এলাকায় কলার চাষ ব্যাপক ভাবে হয়।

কাল বৈশাখীর ঝড় কলা গাছের পরম শত্রু—ঝড়ে কলা ঝাড় ধরাশায়ী হয়। তাই কলার মোচা হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের ঠেকনা দেওয়া প্রয়োজন নচেৎ কাঁদি বড় হবার সাথে মুচড়ে পড়ে যায়।

বিভিন্ন পূজা পার্বণে, কলা গাছ, পেটো, পাতা প্রয়োজন। তাই তো লোকে বলে সর্ব ঘাটের কাঠালি কলা অর্থাৎ প্রত্যেক শুভ কাজেই কলা দরকার। কলার মোচা একটা সুষম খাদ্য একথা আগেই বলেছি। কাঁচা কলার ঝোল, শুক্ত, একটা অপরিহার্য তরকারী, শিশুদের বর্ষাকালে পেটের অসুখ করে কাঁচাকলা সিদ্ধ খাওয়ালে ভাল পেট ভাল থাকবে।

কলার থোর (Solidity) ও মোচা একটা ঔষধ স্বরূপ জানবে।

কলা গাছ গরু মহিষের একটা সুষম খাদ্য এতে পেটঠাণ্ডা রাখে—শুকনা ডাঁটা, পাতা, পেটো জ্বালানি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। পেটো পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া তায় সেটা ক্ষার স্বরূপ। ঐ ছাই জল দিয়ে মেখে ডেলা করে শুকিয়ে নিতে হবে। সংসারের কাপড় চোপড় কাচার সময় গরম জলে 2।4 ডেলা দিয়ে ফুটিয়ে কাপড় চোপড় নিয়ে কলে বেশ সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যাবে। এধরনের পরিষ্কার করার পদ্ধতি আমার পিতৃদেবকে করতে দেখেছিলাম, ফলও ভাল হয়েছিল।

কলায় কি কি পরিমাণ Vitamin আছে তা জানা দরকার।

কাঁচাকলা		পাকাকলা	
Protein প্রোটীন	0·4	Protein প্রোটীন	0·4
Fat	0·1	fat	0·1
Carbohydrates	4.1	Carbohydrates	10·3
Calcium	·3	Calcium	3·0
Iron	8·0	Iron	0·4
VB1	·14	VB1	43·0
VB2	·13	VB2	11·0
Nicotin acid	0·1	VC	85·3
		Nicotin acid	0·1

বিমান বসুর
নক্ষত্র পরিচয়
প্রকাশিত হয়েছে। ১০·০০

অমরনাথ রায়ের
স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

প্রকাশিত হয়েছে। ২৫·০০

পার্থসারথি চক্রবর্তীর
বুদ্ধি নিয়ে খেলা
প্রকাশিত হয়েছে। ১০·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

নাকে রক্ত—খেলাপণ্ড : আশিস দাস

সন্তোষ ট্রফির ফাইনাল দেখার সময় থেকেই রাজকুমার স্কুলের ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেন-স্টপার সোমদেব উত্তেজনায় দাঁতে দাঁত চিপে স্কুলের সবার সামনে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, শুক্রবার সরযূ দেবী চ্যালেঞ্জ শীল্ডে কি করে শশধর বয়েজ স্কুলের স্ট্রাইকার দেবাশিসকে আটকাতে হবে, তা তার ভালভাবেই জানা আছে।

যথাসময়ে খেলা শুরু হয়ে গেছে। ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ খেলা চলছে। এমন সময় হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। সোমদেব হাজার চেষ্টা করে, লেঙ্গী মেরেও দেবাশিসকে আটকাতে পারল না—গোল—ল—ল—চিৎকারে মাঠ ভরে উঠল। শশধর বয়েজ স্কুলের ছেলেরা আনন্দে মাতোয়ারা। সোমদেবের উদ্ধত চ্যালেঞ্জের যোগ্য জবাব দিয়েছে দেবাশিস। এমন সময় মাঠের অপর প্রান্তে অন্য এক চিত্র দেখা গেল। পেনাল্টি বক্সের কাছে সোমদেব নাক টিপে বসে আছে, আর নাক থেকে গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে রাজকুমার স্কুলের ছেলেরা মার—মার বলে তেড়ে আসছে রেফারী আর দেবাশিসের দিকে। খেলা বন্ধ। মাস্টার মশাইরা মাঠের মধ্যে ছুটে গেলেন। কি ব্যাপার,—ছেলেরা বলল, স্যার, দেবাশিস, আমাদের সোমদেবের নাকে ঘুঁষি মেরে নাকে ফাটিয়ে দিয়েছে বলেই গোলটা হ'ল। সুতরাং এ গোল নাকচ এবং পেনাল্টি দিতেই হবে। দেবাশিসকে আমাদের হাতে দিন, আমরা দেখে নিচ্ছি। এদিকে সোমদেবের জন্য মাঠের মধ্যে ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। তিনি সোমদেবের প্রাথমিক চিকিৎসা করে বললেন,—তোমরা মিছেমিছি নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করছো। সোমদেবের নাকে কেউই আঘাত করেনি। সোমদেব নিজেই বলছে, মাঝে মধ্যে ওর নাক দিয়ে এমনিই রক্ত পড়ে। রেফারী, মাষ্টার মশাই, ছেলেরা সবাই সোমদেবের কাছে এসে হাজির। সোমদেব তাড়াতাড়ি নিজেই বলল, হ্যাঁ, স্যার, আমার নাক দিয়ে মাঝে মাঝেই রক্ত পড়ে। ততক্ষণে বহু সময় নষ্ট হয়ে গেছে। মাঠে আলোও যথেষ্ট কমে গেছে। রেফারী খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করে মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন। এদিকে মাঠভর্তি দর্শক গজ গজ করতে করতে বললেন, একটু ভুল বোঝাবুঝির জন্যই আজকের খেলাটা পণ্ড হল। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করছে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে কেন? এই স্বল্প পরিসরে তো নাক দিয়ে রক্ত পড়ার সব কারণ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে প্রধান কয়েকটা কারণ ও তার প্রতিকার জানা যাক।

যে কোন লোকের হঠাৎ নাক দিয়ে রক্ত পড়া আমরা অনেকেই দেখেছি। কিন্তু সেই দেখে অনেকের ভয়ে হাত পা কাঁপতে শুরু করে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। বহু কারণে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে তারমধ্যে জন্মগত, বংশগত, আঘাত জনিত, জীবাণুর সংক্রমণ এবং উচ্চ রক্ত চাপ প্রধান কারণ। যাঁরা উচ্চ-রক্ত চাপ বা হাইপারটেনশনে ভোগেন তাদের হঠাৎ নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাওয়া এমন কিছু ভয়ের নয় বরং ভাল বলা যায়। কারণ নাকের মধ্যে অবস্থিত সূক্ষ্মসূক্ষ্ম রক্তজালিকা ছিঁড়ে গিয়ে দেহের অতিরিক্ত রক্তের চাপ কমিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে নাকের রক্ত জালিকাগুলি সেফ্‌টি ভাল্বের কাজ করে, কিছু অতিরিক্ত রক্ত বের করে রক্ত চাপ কমিয়ে দেয়। এঁদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ব্লাড প্রেসার মেপে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ছোটদের ক্ষেত্রে নাকের মধ্যে সেপ্টামে ঘায়ের জন্য রক্ত পড়তে পারে। আর আঘাতের জন্য রক্ত পড়তে পারে সোমদেবের নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কারণ সম্পূর্ণ বংশগত। সোমদেবের বাবারও ছোট-বেলা থেকে যখন তখন বিশেষতঃ বেশি উত্তেজনায় নাক দিয়ে রক্ত পড়তো। সোমদেবের ক্ষেত্রেও হঠাৎ গোল খেয়ে হেয়ে যাবার দুশ্চিন্তায় ও উত্তেজনায় রক্ত পড়তে শুরু করে। বাবা অথবা মায়ের 'জিন' থেকে এই উপসর্গ সন্তানদের মধ্যে বাহিত হয়। নাক দিয়ে রক্ত পড়লে ভয়ে হকচকিয়ে না গিয়ে বরফ বা ঠাণ্ডা জল দিলে অনেক সময় রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। এই ভাবে যদি রক্ত বন্ধ না হয় তবে তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে নাক চেপে অনেক সময় রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। এই সব পদ্ধতিতে রক্ত পড়া বন্ধ না হলে অ্যানটেরিয়র ন্যাজাল প্যাক অর্থাৎ পরিষ্কার তুলো বা গজ নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে শতকরা নব্বইভাগ ক্ষেত্রে নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। খানিকটা বা গজ তুলোতে অ্যানটিসেপ্টিক ক্রীম লাগিয়ে নাকের মধ্যে প্রবেশ করানোকে ন্যাজাল প্যাক বলে। নাকের পেছন অঞ্চল থেকে যদি রক্ত ক্ষরণ হয় তবে পষ্টিরিয়র ন্যাজাল প্যাকের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে ই. এন. টি. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা নাক দিয়ে ক্যাথিটার প্রবেশ করিয়ে যখন সেই ক্যাথিটারের সামনের দিক মুখগহ্বরে দেখতে পান তখন ফরসেপের সাহায্যে সেই ক্যাথটার টেনে এনে গজের প্যাক ঝুলিয়ে দেন। তারপর আস্তে আস্তে ক্যাথিটার বের করে আনেন ও গজের প্যাক ন্যাসোফ্যারিং কস-এ আটকে যায়। এবং রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

1 বি মোহনলাল স্ট্রীট, কলকাতা-7000081

কড়ি (Cowrie)

সলিল রাহা

সমুদ্রের সবরকম প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে সম্ভবতঃ কড়িই সবথেকে মনোলোভা এবং মূল্যবান। বিচিত্রবর্ণের ছোট, বড় এবং বিভিন্ন আকৃতির এই শম্বুকের খোলকগুলি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছেই চিত্তাকর্ষক এবং দিনে দিনে এদের সর্বজন-

নানা রকম কড়ি

প্রিয়তা বেড়েই চলেছে। অনেকেই এখন কড়ি সংগ্রহের জন্য অনেক দাম দিতেও প্রস্তুত। যদিও একসময় প্রচলিত মুদ্রা হিসাবে কড়িই ব্যবহার হত। ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র কড়ির বিনিময়ে পাওয়া যেত। বর্তমানেও পৃথিবীর কোথাও কোথাও কড়ির মাধ্যমে জিনিসপত্রের আদান-প্রদান চালু আছে।

মোলাস্কা (Mollusca) পর্বভুক্ত গ্যাসট্রোপোড (Gastropod) শ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণী কড়ি বিভিন্ন প্রজাতির। বেশির ভাগই cypraea গণের অন্তর্গত এবং গোল্ডেন কড়ি, স্পটেড্ কড়ি, ফাল্টন কড়ি, হিরাসেস্ কড়ি, হোয়াইট টুথ্‌ড কড়ি প্রভৃতি সাধারণ নামে পরিচিত। ভারত প্রশান্ত মহাসাগরেই এদের প্রাচুর্য এবং বিশেষ করে প্রবাল —শৈল শ্রেণীর কাছাকাছি এদের বাস। স্পঞ্জ, প্রবাল, অ্যাসিডিয়া প্রভৃতি নরম দেহযুক্ত প্রাণীদের এরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে।

হাজার হাজার বছর ধরে Money কড়ির ব্যবহার সর্বজনবিদিত। প্রাচীন এই মুদ্রা cypraea moneta নামক খোলক এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় 2·6 সেণ্টিমিটার। সেই স্মরণাতীত কাল থেকেই মধ্য-ইউরোপ এবং ককেশাশ্ অঞ্চলে প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌দের সহায়তায় এই প্রজাতির এবং এদের ঘনিষ্ঠতম প্রজাতির খোলক মাটি খুঁড়ে টেনে তোলার চেষ্টা হয়েছে। আফ্রিকাতে কড়ির প্রচলন বহুদিনের। সাহারা থেকে বেসিন উপসাগরীয় অঞ্চল এবং নাইজারবেনু থেকে কঙ্গো-খুওয়ালবা পর্যন্ত কড়ির ব্যবহার বিস্তৃত ছিল। আফ্রিকাতে কড়ির বিনিময়ে স্ত্রীলোকও (wives) ক্রয় করতে হত। যুবতী স্ত্রীদের ক্ষেত্রে 60,000 থেকে 100,000 কড়ি যার মূল্য প্রায় 20-40 ডলার। বয়স্কা স্ত্রীদের জন্যও প্রায় 20,000 কড়ি গুণতে হত। ভারতবর্ষেও বহু আগে মুদ্রা হিসাবে কড়ির ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। পুরনো তথ্য থেকে জানা যায় যে কড়ির বিনিময়েও বাংলো পাওয়া যেত। একটি সম্পূর্ণ বাংলো তৈরি করতে প্রায় 4,000 টাকা খরচ হত। তখনকার দিনে 64 কড়ির দাম ছিল মাত্র এক পয়সা।

সৌন্দর্যবর্ধক, অলঙ্কার ও অন্যান্য শিল্প সামগ্রী হিসাবে এইসব কড়ির বহুল ব্যবহার আজও প্রচলিত। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বিবাহ উৎসবে কড়ি অপরিহার্য।

বর্তমানে কড়ি দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লিখিত কড়ির মধ্যে ফাল্টন কড়ি খুবই দুঃপ্রাপ্য। তার কারণ এই কড়ি সাধারণতঃ গভীর সমুদ্রের কয়েকটি মাছের পাকস্থলীতেই থাকে। চমকপ্রদ স্পটেড্ কড়ির সংখ্যা খুবই কম। আজ পর্যন্ত মাত্র 16টির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ম্যাণ্টল থেকে নিঃসৃত পদার্থ দ্বারাই এদের একটিমাত্র পেচানো শক্ত খোলক সৃষ্টি হয়। খোলকের বাইরের দিক উত্তল এবং ভেতরের দিক অবতল। অপরিণত খোলকে এনামেলের স্তর কম থাকে এবং সেই কারণেই ধর্মভেদ দেখা যায়। তাই সাধারণ প্রজাতির কড়ির পরিণত খোলকের উপরিতলের এনামেল স্তর তুলে পুনরায় পালিশ করে দুষ্প্রাপ্য কড়ি প্রজাতি হিসাবে পর্যটকদের কাছে বিক্রি করার প্রচলন আজও শেষ হয়ে যায় নি।

ইয়ারো স্যাফটে পৌঁছে গেলেন স্টার।
ইস, সেই ধাঁচাটা-- যেন হাহাকার করছে!
দশ বছরে সব যেন শ্মশান হয়ে গেছে।
মইয়ের পর মই এখানে নেমে গেছে গভীর পাতালে। আগে ছিল একটা দোলনা-মই। তাই বেয়েই ওঠানামা করতো শ্রমিকের দল।
আজ সব উধাও হয়ে গেছে। এখন মইগুলোই একমাত্র পথ। ডোচার্টি পিটের নিচে যাবার কোনও সহজ উপায় আর নেই। তাই না হ্যারি?
এখনো সব মনে রেখেছেন স্যার?
একি কখনো ভোলা যায়?
আমি তাহলে নেমে যাচ্ছি স্যার। আপনি আমার পিছু পিছু আসুন।
ঠিক আছে হ্যারি।
ওহ, আজ দশ বছর এসব দেখিনি। সব আগের মতোই আছে তো?
হ্যাঁ স্যার।
5

আস্তে হ্যারি, একটু আস্তে। আজ কতোকাল এভাবে নামিনি।
ঠিক আছে স্যার। আপনি সব দেখতে পাচ্ছেন তো?
ওহ, হ্যাঁ। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।
সাতটা মই নেমেছি। এবার একটু জিরিয়ে নিই।
নিচে যেন কার গলা শোনা যাচ্ছে! গান গাইতে গাইতে উঠে আসছে মনে হয়। কার গলা?
বুঝতে পারছি না স্যার। আমাদের তো কোনও প্রতিবেশী নেই।
ওহ স্যার, এবার বুঝেছি। আমার বন্ধু – জ্যাক রিয়ান। সবোবর-সঙ্গীত গাইতে গাইতে উঠে আসছে।
এসে পড়লো জ্যাক?
আরে, তুই! কী খবর? এমন অসময়ে?
নেমন্তন্ন করতে এলাম। সামনের সপ্তাহে একটা গান-বাজনার আসর বসছে। তুই যাচ্ছিস।
ওহ, নিশ্চয়। স্যারও যাবেন।

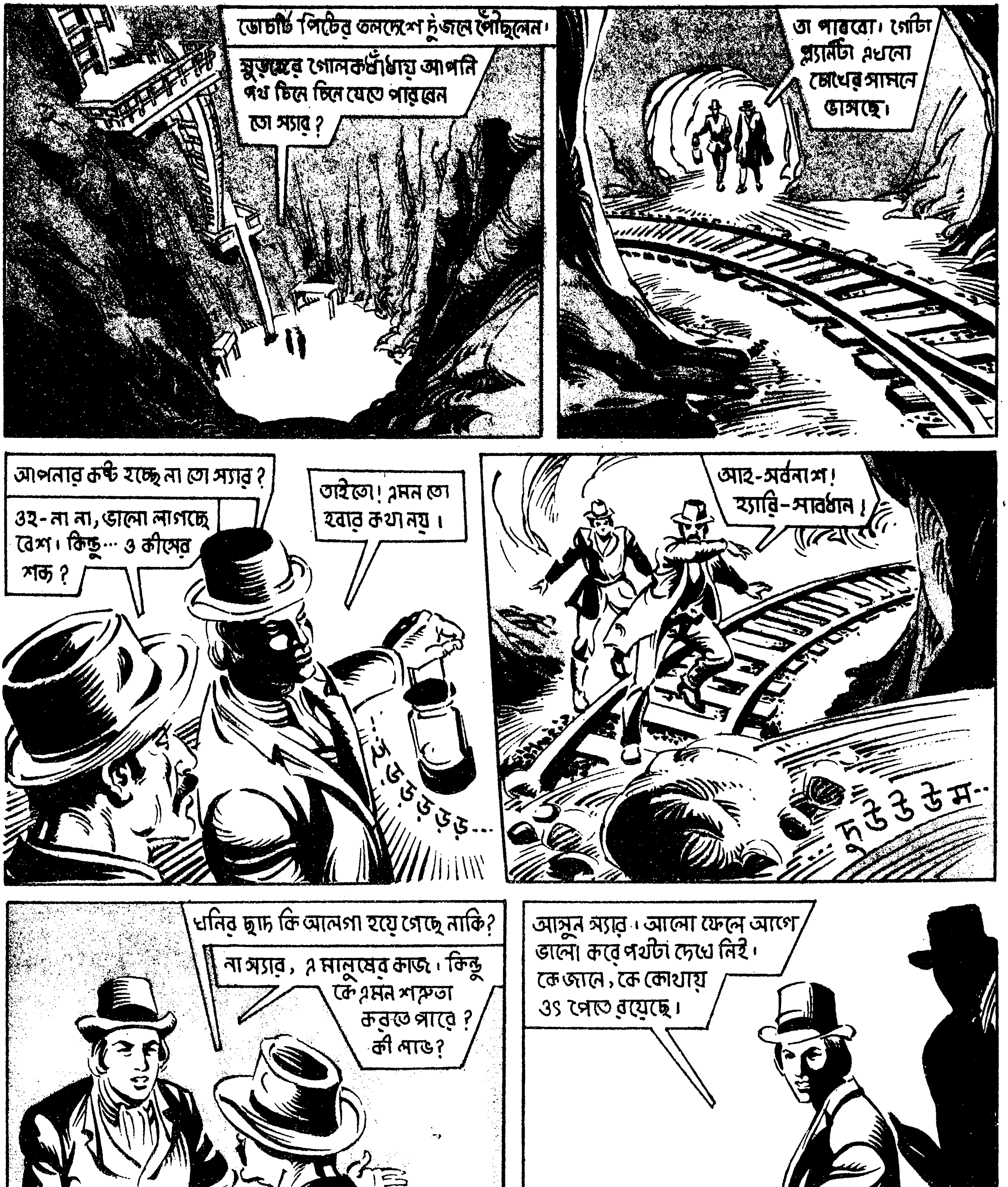
ডোচার্টি পিটের তলদেশে দুজনে পৌঁছলেন।
সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় আপনি পথ চিনে চিনে যেতে পারবেন তো স্যার?
তা পারবো। গোটা প্ল্যানটা এখনো চোখের সামনে ভাসছে।
আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো স্যার?
ওহ-না না, ভালো লাগছে বেশ। কিন্তু... ও কীসের শব্দ?
তাইতো! এমন তো হবার কথা নয়।
...গুড়ুড়ুড়ুড়...
আহ-সর্বনাশ! হ্যারি-সাবধান!
দুউউউম...
খনির ছাদ কি আলগা হয়ে গেছে নাকি?
না স্যার, এ মানুষের কাজ। কিন্তু কে এমন শত্রুতা করতে পারে? কী লাভ?
আসুন স্যার। আলো ফেলে আগে ভালো করে পথটা দেখে নিই। কে জানে, কে কোথায় ওৎ পেতে রয়েছে।

পৌঁছে গেলেন দুজনে। বাসগৃহের সামনেই সাইমন দাঁড়িয়ে।
আসুন, আসুন স্যার। দশ বছর পর এই সুড়ঙ্গে আপনার পায়ের ছাপ পড়লো।
তা ঠিক, তুমি ভালো আছো তো সাইমন?
হ্যাঁ স্যার, খুউব ভালো।
দ্বিতীয় চিঠিটা এগিয়ে দিলেন স্টার।
দেখো তো, কার হাতের লেখা। চিনতে পারছো?
না স্যার।
কার আবার? যে চায়না মিস্টার স্টার এখানে আসেন।
পাথর ফেলে যে মারতে চেয়েছিল আমাদের।
খাওয়া-দাওয়ার পর···
হ্যারি, সেফটি ল্যাম্পটা জ্বালাও।
আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না সাইমন। সেফটি ল্যাম্প কেন? খনিতে তো দাহ্য গ্যাস থাকার কথা নয়।
চলুন স্যার। বেশী নয়-আর্ধ মাইল, তার পর নিজের চোখেই সব দেখবেন।
গৌতম
পথ অবশেষে শেষ হয়ে গেল। সামনে নিরেট দেওয়াল।
কয়লার শেষ চাঙড়টা তো এখান থেকেই তোলা হয়েছিল, তাই না সাইমন? কয়লা তো নয়, যেন খনির মৃতদেহ।
ভুল, মহাভুল হয়ে গেছে স্যার। খনি মরেনি। আজও তার হৃৎস্পন্দন চলছে।

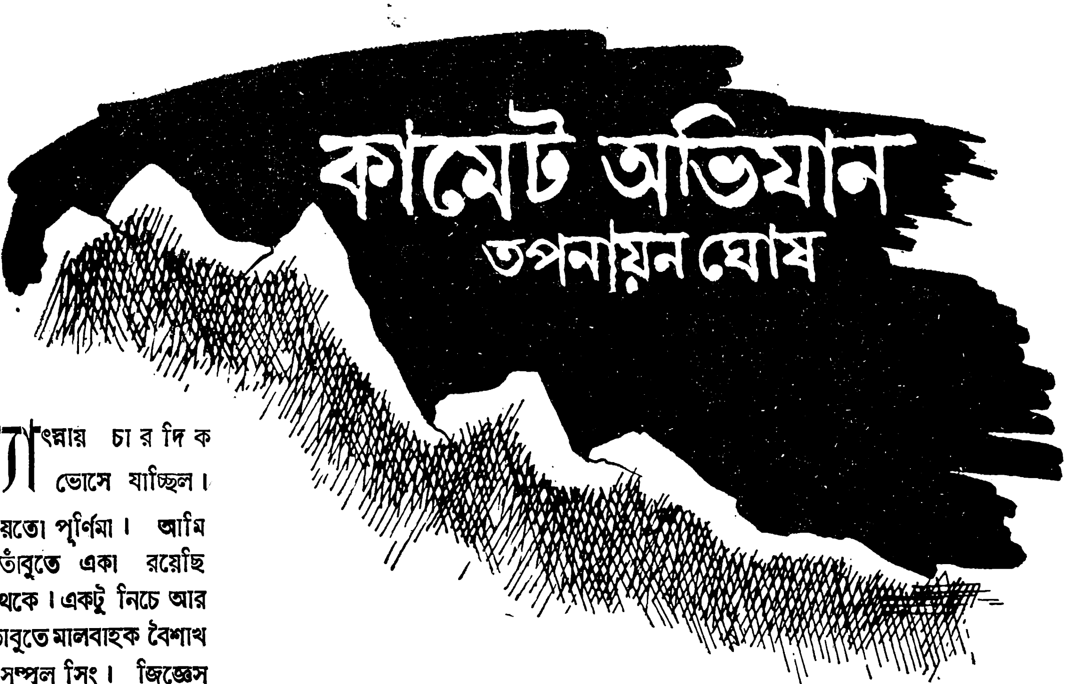

কামেট অভিযান

তপনায়ন ঘোষ

জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছিল। আজ হয়তো পূর্ণিমা। আমি একটা তাঁবুতে একা রয়েছি কদিন থেকে। একটু নিচে আর একটা তাঁবুতে মালবাহক বৈশাখ সিং ও সিম্পল সিং। জিজ্ঞেস করলাম, বৈশাখজি আজ কি পূর্ণিমা? তাঁবুর দরজাথেকে কোনও রকমে মুখ বার করে বললো, হো স্যকতা।

সন্ধে হতে না হতেই রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। ওরা দুজন তাঁবুর ভেতর শ্লিপিং ব্যাগে ঢুকে গেছে। আমি তাঁবুর বাইরে। ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে। তাঁবুটা পুবদিকে মুখ করে খাটানো। পশ্চিমে তুষার শৈলামালা, প্রথমটা 'মানা', দ্বিতীয়টির নামাকরণ হয়নি। পরেরটি দেউবন। তারপর আরো কিছু নামহীন শৃঙ্গ। দেউবনের চূড়াটি বাসুকির ফনার মতো। ভারী সুন্দর।

অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল। মেরু অঞ্চলের তুষার ভালুকের তীক্ষ্ণ নখের মতো শীত গায়ে আঁচর কাটছে। তবুও তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। তুষার শৃঙ্গগুলো থেকে যেন আলো ছিটকে পড়ছে। 'মানার' পাশে একটু উত্তর পশ্চিমে 'কামেট' শৃঙ্গ। ভারতের তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। 25447 ফুট উঁচু। কামেটের পুব ঢাল থেকে নেমে এসেছে হিমবাহ। এর নাম পূর্বী কামেট হিমবাহ (গ্লেসিয়ার)। হিমবাহ নেমে গেছে অনেক নিচে 18/19 কিলোমিটার লম্বা একটা বরফের নদী।

জ্যোৎস্না যেন ঐ হিমবাহ ধরে ওপরে উঠে আসছে। আমি চেয়ে আছি নরম আলোয় মাখামাখি পাহাড়ের দিকে। আমার বাঁয়ে উত্তর থেকে পুব দিকে চলে গেছে আর একটা ন্যাড়া পাহাড়। এই পাহাড়টার গায়ে বরফ নেই বললেই চলে। আমার একদম পছন্দ নয়। এটার নাম রেখেছি আড়াল পাথর। এই পাহাড় মালাটির জন্য আমার তাঁবুতে রোদ আসে অনেক দেরিতে। অনেক বেলা পর্যন্ত সূর্যকে আড়াল করে রাখে। আমাদের এই ক্যাম্পের পাশে ঐ পাহাড়। তিনটে ঝরণা নেমে গেছে। সারাদিন ঝরঝর করে জল পড়ে।

চাঁদের আলোয় ঝরণাগুলো দেখতে গিয়ে দেখি সেগুলো উধাও। কোথাও জলপড়ার শব্দ নেই। কে যেন একদম উপর থেকে ঝরণার কলগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। সকালে প্রতিদিন দেখি পাহাড়ের গায়ে কটি শাদা দাগটানা রয়েছে। বরফের দাগ। ওগুলোই আসলে ঝরণা। একটু বেলা হলে বরফ গলবে। ঝরণাগুলো চালু হবে। আবার সন্ধে হতে না হতেই কোথা থেকে যত রাজ্যের শীত নেমে আসবে। ঝরণা জমে যাবে।

এক মনে পাহাড়ের রূপ দেখছি। হঠাৎ বেশ জোরে একটা গুড়্‌গুড়্‌ আওয়াজ হলো। চাঁদের ধোঁয়াটে আলোয়

দেখতে পেলাম 'মানা' শৃঙ্গের মাথা থেকে তুষ্যর ধস (অ্যাভালেন্স) নামলো। মেঘের মতো বরফ কুঁচো ছড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে নিচে। বরফের ঢল নেমে গেল বরফনদী দিয়ে।

আমাদের ক্লাবটার নাম হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন। কলেজ স্ট্রিটে তার অফিস। আগস্টের 20 তারিখ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু আমাদের অভিযাত্রীদলের দলনেতা উজ্জ্বল গাঙ্গুলির হাতে জাতীয় পতাকা ও ক্লাবের পতাকা তুলে দিলেন। সেদিনই রাতে দুন এক্সপ্রেসে আমরা চাপলুম। দলের সদস্য সুশান্ত মজুমদার ও লাকপা, শেরপা তিনদিন আগে চলে গেছে। ওরা কিছু কেনাকাটা ও অফিসের কাজ সেরে রাখবে। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন উপনেতা অতনু চ্যাটার্জি, অলোক বসু, সুভাষ দাস, দিব্য মুখার্জি, একমাত্র মহিলা সদস্যা বাণী বসু, ডাক্তার অরুণ ভট্টাচার্য ও আমি। শেরপা এসেছে দার্জিলিং থেকে। লাকপা ওদের নেতা। বাকিরা হলো কামি শেরিং, কি কামি ও দাওয়া নরবু। কামি শেরিং তার 5 বছরের ছেলে ফুরবাকে নিয়ে এসেছে। ফুরবা শেরপার কাজ শিখতে এসেছে। সবাই-মিলে আমরা চলেছি হিমালয়ের কামেট ও আবিসামিন শৃঙ্গ অভিযান করতে। উত্তর প্রদেশের গারোয়াল অঞ্চলের চামোলি জেলায় তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত।

22 তারিখ ভোরে হরিদ্বারে নেমেই বাসের জন্য ছুটতে হলো। যোশীমঠের বাস ভোরে চলে গেছে। পরদিন ছাড়া পাওয়া যাবে না। রূদ্রপ্রয়াগের একটা বাস পাওয়া গেল। ছোট বাস। আমাদের মালপত্রে ছাদ ভরে গেছে। আমরা সঙ্গে অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে চলেছি। মাছ, মাংস, ফল ও ফলের রসের কৌটো। বিস্কুটের টিন। তেল, ঘি, চিজ, মাখন নানাধরনের খাবার বাসনপত্র, দড়িদড়া পাহাড়ে ওঠার সরঞ্জাম। এছাড়া নিজেদের রাক-ম্যান তো আছেই।

হৃষীকেশের পর থেকেই পাহাড়ি রাস্তা। দুপাশে গাছ। ঘন বন। এক দিকে দিকে নিচে অনেক গভীরে গঙ্গা প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। দেবপ্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে অলকানন্দা। আমাদের রাস্তা ঝোলানো ব্রিজের উপর দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে চলে গেছে অলকানন্দার গা ঘেসে। বেলা দুটো আড়াইটেয় রূদ্রপ্রয়াগ পৌঁছুলাম। ছোট্ট পাহাড়ি শহর। রূদ্রপ্রয়াগে নেমেই জিম করবেটের কথা মনে পড়লো। এক মানুষ খেকো চিতাবাঘকে মারার শিহরণ অনুভব করলাম।

রাস্তার পাশে আমরা মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছি। কজন ঘরের খোঁজ করছে। কজন গাড়ির। আমরা যোশীমঠ যেতে চাই। এর মধ্যে একটা বাস এলো যোশীমঠ যাবে। তবে রাতটা কর্ণপ্রয়াগে থাকবে। আমরা রাজী হয়ে গেলাম। প্রথমে বাসের কণ্ডাক্টর মালপত্র দেখেনি। কিছু মাল ছাদে উঠতেই তারা বেঁকে বসলো। অনেক ভাড়া চাইলো। ভাড়া নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত বাসের যাত্রী ও স্থানীয় লোকেরা হস্তক্ষেপ করলো। একটা মীমাংসা হলো।

সন্ধ্যায় কর্ণপ্রয়াগ পৌঁছুলাম। অনেক চেষ্টা করেও একটা বড় ঘর পাওয়া গেলনা। এতোগুলো লোক নিয়ে আমরা মুশকিলে পড়ে গেলাম। সারারাত বাসেই কাটিয়ে দিলাম। কর্ণপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে ধৌলিগঙ্গা মিশছে। দীর্ঘ রাস্তা পর্যন্ত ধৌলিগঙ্গা আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। সকালে বাস ছাড়লো আঁকাবাঁকা চড়াই উৎরাই পথ ধরে বাস চলেছে। দুপুর বারোটা নাগাদ যোশীমঠ পৌঁছে গেলাম। বাস স্ট্যাণ্ডে সুশান্ত ও লাকপা অপেক্ষা করছিল।

কলকাতা থেকে আমরা যোশীমঠের সেনা ডাক্তার লেফট্যানেন্ট কর্নেল পালের নামে চিঠি নিয়ে এসেছি। লেঃ কর্নেল পালের সঙ্গে আমাদের ঘটনাচক্রে রূদ্রপ্রয়াগেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। তিনি কলকাতা ফিরছেন। তবে তিনি আর এক ডাক্তার মেজর গাঙ্গুলির নামে চিঠি দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ডাক্তার অরুণ ভট্টাচার্য রাস্তা থেকে সেনাবাহিনীর জিপ ধরে মেজর গাঙ্গুলির খোঁজে বেরিয়ে গেল।

আমরা মালপত্র নিয়ে সেনা হাসপাতালের গেস্টহাউসে চলে গেলাম। শেরপারা রইল নিচে হোটেলে। আমাদের বাংলো থেকে শংকরাচার্যের মন্দিরটি পরিষ্কার দেখা যায়। দু তিন মিনিটের পথ। নতুন রং হয়েছে। ঝকঝক করছে।

যোশীমঠে চারদিন কেটে গেল। আমরা যেখানে যাবো সে অঞ্চলে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। দিল্লি থেকে ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন আমাদের অভিযানের অনুমতি যোশীমঠের মহকুমা শাসককে পাঠিয়েছেন। তবুও এই সব কার্জ সারতে দুদিন চলে গেল। রাস্তায় ধস নেমেছিল বলে আরো একটা দিন আটকে গেলাম। সেনাবাহিনী একটা ট্রাক দিয়েছিল। ট্রাক আমাদের মালারি পৌঁছে দেবে।

শের সিং কদিন থেকে আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। ওরা লতাগ্রামের লোক। মালারির পথেই লতাগ্রাম। এই গ্রামের বেশির ভাগ পুরুষই অভিযাত্রীদের মাল বওয়ার কাজ করে। এদের বলে হাই অলটিচ্যুড পোর্টার (হ্যাপ)। সাতজন পোর্টার চললো আমাদের সঙ্গে। শের সিং ওদের নেতা। যোশীমঠ থেকে চাল, ডাল, আটা, মসলাপাতি, কেরোসিন ও সবজি কেনা হয়েছে। লতাগ্রাম থেকে আলু কপি ও আপেল উঠলো।

মালারি পর্যন্ত পাকা রাস্তা রয়েছে। গাড়ি চলে। প্রায় দশ হাজার ফুট উচুঁতে এই গ্রামটি। গ্রাম বললে অবশ্য ভুল হয়। পাহাড়ি গঞ্জ একটা। শ'পাঁচেক বাড়ি ঘর রয়েছে। যোশীমঠ থেকে এখানকার সেনা ক্যাম্পে

দেখতে পেলাম 'মানা' শৃঙ্গের মাথা থেকে তুষার ধস (অ্যাভালেন্স) নামলো। মেঘের মতো বরফ কুঁচো ছড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে নিচে। বরফের ঢল নেমে গেল বরফনদী দিয়ে।

আমাদের ক্লাবটার নাম হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন। কলেজ স্ট্রিটে তার অফিস। আগস্টের 20 তারিখ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু আমাদের অভিযাত্রীদলের দলনেতা উজ্জ্বল গাঙ্গুলির হাতে জাতীয় পতাকা ও ক্লাবের পতাকা তুলে দিলেন। সেদিনই রাতে দুন এক্সপ্রেসে আমরা চাপলুম। দলের সদস্য সুশান্ত মজুমদার ও লাকপা, শেরপা তিনদিন আগে চলে গেছে। ওরা কিছু কেনাকাটা ও অফিসের কাজ সেরে রাখবে। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন উপনেতা অতনু চ্যাটার্জি, অলোক বসু, সুভাষ দাস, দিব্য মুখার্জি, একমাত্র মহিলা সদস্যা বাণী বসু, ডাক্তার অরুণ ভট্টাচার্য ও আমি। শেরপা এসেছে দার্জিলিং থেকে। লাকপা ওদের নেতা। বাকিরা হলো কামি শেরিং, কি কামি ও দাওয়া নরবু। কামি শেরিং তার 5 বছরের ছেলে ফুরবাকে নিয়ে এসেছে। ফুরবা শেরপার কাজ শিখতে এসেছে। সবাই-মিলে আমরা চলেছি হিমালয়ের কামেট ও আবিসামিন শৃঙ্গ অভিযান করতে। উত্তর প্রদেশের গারোয়াল অঞ্চলের চামোলি জেলায় তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত।

22 তারিখ ভোরে হরিদ্বারে নেমেই বাসের জন্য ছুটতে হলো। যোশীমঠের বাস ভোরে চলে গেছে। পরদিন ছাড়া পাওয়া যাবে না। রুদ্রপ্রয়াগের একটা বাস পাওয়া গেল। ছোট বাস। আমাদের মালপত্রে ছাদ ভরে গেছে। আমরা সঙ্গে অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে চলেছি। মাছ, মাংস, ফল ও ফলের রসের কৌটো। বিস্কুটের টিন। তেল, ঘি, চিজ, মাখন নানাধরনের খাবার বাসনপত্র, দড়িদড়া পাহাড়ে ওঠার সরঞ্জাম। এছাড়া নিজেদের রাক-ম্যান তো আছেই।

হৃষীকেশের পর থেকেই পাহাড়ি রাস্তা। দুপাশে গাছ। ঘন বন। এক দিকে দিকে নিচে অনেক গভীরে গঙ্গা প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। দেবপ্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে অলকানন্দা। আমাদের রাস্তা ঝোলানো ব্রিজের উপর দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে চলে গেছে অলকানন্দার গা ঘেসে। বেলা দুটো আড়াইটেয় রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছুলাম। ছোট্ট পাহাড়ি শহর। রুদ্রপ্রয়াগে নেমেই জিম করবেটের কথা মনে পড়লো। এক মানুষ খেকো চিতাবাঘকে মারার শিহরণ অনুভব করলাম।

রাস্তার পাশে আমরা মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছি। কজন ঘরের খোঁজ করছে। কজন গাড়ির। আমরা যোশীমঠ যেতে চাই। এর মধ্যে একটা বাস এলো। যোশীমঠ যাবে। তবে রাতটা কর্ণপ্রয়াগে থাকবে। আমরা রাজী হয়ে গেলাম। প্রথমে বাসের কণ্ডাক্টর মালপত্র দেখেনি। কিছু মাল ছাদে উঠতেই তারা বেঁকে বসলো। অনেক ভাড়া চাইলো। ভাড়া নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত বাসের যাত্রী ও স্থানীয় লোকেরা হস্তক্ষেপ করলো। একটা মীমাংসা হলো।

সন্ধ্যায় কর্ণপ্রয়াগ পৌঁছুলাম। অনেক চেষ্টা করেও একটা বড় ঘর পাওয়া গেলনা। এতোগুলো লোক নিয়ে আমরা মুশকিলে পড়ে গেলাম। সারারাত বাসেই কাটিয়ে দিলাম। কর্ণপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে ধৌলিগঙ্গা মিশছে। দীর্ঘ রাস্তা পর্যন্ত ধৌলিগঙ্গা আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। সকালে বাস ছাড়লো আঁকাবাঁকা চড়াই উৎরাই পথ ধরে বাস চলেছে। দুপুর বারোটা নাগাদ যোশীমঠ পৌঁছে গেলাম। বাস স্ট্যাণ্ডে সুশান্ত ও লাকপা অপেক্ষা করছিল।

কলকাতা থেকে আমরা যোশীমঠের সেনা ডাক্তার লেফট্যানেণ্ট কর্নেল পালের নামে চিঠি নিয়ে এসেছি। লেঃ কর্নেল পালের সঙ্গে আমাদের ঘটনাচক্রে রুদ্রপ্রয়াগেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। তিনি কলকাতা ফিরছেন। তবে তিনি আর এক ডাক্তার মেজর গাঙ্গুলির নামে চিঠি দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ডাক্তার অরুণ ভট্টাচার্য রাস্তা থেকে সেনাবাহিনীর জিপ ধরে মেজর গাঙ্গুলির খোঁজে বেরিয়ে গেল।

আমরা মালপত্র নিয়ে সেনা হাসপাতালের গেস্টহাউসে চলে গেলাম। শেরপারা রইল নিচে হোটেলে। আমাদের বাংলো থেকে শংকরাচার্যের মন্দিরটি পরিষ্কার দেখা যায়। দু তিন মিনিটের পথ। নতুন রং হয়েছে। ঝকঝক করছে।

যোশীমঠে চারদিন কেটে গেল। আমরা যেখানে যাবো সে অঞ্চলে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। দিল্লি থেকে ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন আমাদের অভিযানের অনুমতি যোশীমঠের মহকুমা শাসককে পাঠিয়েছেন। তবুও এই সব কাজ সারতে দুদিন চলে গেল। রাস্তায় ধস নেমেছিল বলে আরো একটা দিন আটকে গেলাম। সেনাবাহিনী একটা ট্রাক দিয়েছিল। ট্রাক আমাদের মালারি পৌঁছে দেবে।

শের সিং কদিন থেকে আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। ওরা লতাগ্রামের লোক। মালারির পথেই লতাগ্রাম। এই গ্রামের বেশির ভাগ পুরুষই অভিযাত্রীদের মাল বওয়ার কাজ করে। এদের বলে হাই অলটিচ্যুড পোর্টার (হ্যাপ)। সাতজন পোর্টার চললো আমাদের সঙ্গে। শের সিং ওদের নেতা। যোশীমঠ থেকে চাল, ডাল, আটা, মসলাপাতি, কেরোসিন ও সবজি কেনা হয়েছে। লতাগ্রাম থেকে আলু কপি ও আপেল উঠলো।

মালারি পর্যন্ত পাকা রাস্তা রয়েছে। গাড়ি চলে। প্রায় দশ হাজার ফুট উচুঁতে এই গ্রামটি। গ্রাম বললে অবশ্য ভুল হয়। পাহাড়ি গঞ্জ একটা। শ'পাঁচেক বাড়ি ঘর রয়েছে। যোশীমঠ থেকে এখানকার সেনা ক্যাম্পে

ফোন করেছিল। ওরাই আমাদের থাকবার জায়গা ঠিক করে রেখেছে।

28 আগস্ট। সবাই সকাল সকাল উঠে পড়েছি। বেশ ঠাণ্ডা। রান্না হচ্ছে। অন্যদিকে মালপত্র বাঁধছি। এদিন থেকে আমাদের অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো। বেস ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য হাঁটা শুরু হবে। সকালে খিচুঁড়ি খাওয়া হলো। আমরা তৈরি হয়ে গেছি। খচ্চরও চলে এসেছে। মাল বওয়ার জন্য আমরা 18টি খচ্চর ভাড়া নিয়েছি। মাল ওজন করে খচ্চরের পিঠে তোলা হচ্ছে। বেসক্যাম্প পর্যন্ত খচ্চরের পিঠে মাল যাবে। আমরা কজন আগে রওনা হয়ে গেলাম। ডাক্তার গেল গ্রামে এক অসুস্থকে চিকিৎসা করতে।

এক সময় এই গ্রামটির জমজমাট অবস্থা ছিল। তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা চলতো। 62 সালের পর তা বন্ধ হয়ে গেছে। জোরে হেঁটে এসে দিব্য আমাদের ধরে ফেললো। চারজন শের পাও চলে এসেছে। দোকানে চা-বিস্কুট খেয়ে চিঠি লিখলাম।

আরো দু কিলোমিটার হেঁটে 'ঘামশালি' গ্রাম পড়লো। এখানে ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিসের চেক পোস্ট। এখানে কাগজ পত্র দেখিয়ে আগে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যাবে। পারমিটের কাগজপত্র সঙ্গে নেই। পেছনে দলনেতা উজ্জ্বল গাঙ্গুলির কাছে। পুলিসের লোকেরা আমাদের বসিয়ে চা খাওয়ালো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ছেড়েও দিল। তবে শর্ত রইল ওরা যতক্ষণ না বলছে, আমরা নিতি গ্রাম ছেড়ে যেতে পারবো না। নিতিতে আমরা রাত কাটাবো। মালারি থেকে নিতির দূরত্ব প্রায় 20 কিলোমিটার।

সন্ধের আগেই আমরা 'নিতি' গ্রামে পৌঁছে গেলাম। আমাদের চলার রাস্তায় এটিই শেষ জনবসতি। প্রায় এগারো হাজার ফুট উচ্চতায় এই গ্রামটি অবস্থিত। একটি প্রাথমিক স্কুলে আমরা আশ্রয় নিলাম ঘোড়াওয়ালারা বাইরে রয়েছে। তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়লাম।

29 তারিখ সকালে আমরা 'নিতি' গ্রাম ছাড়লাম। 3 দিন প্রায় 12 কিলোমিটার হাঁটতে হবে। সবটাই সংকীর্ণ গিরিপথ। নিতি আসবার পথেই আমরা আর একবার ধৌলি পেরিয়েছি। আবার সে বাঁদিকে চলে এসেছে। আমরা যে পথে চলেছি তার নাম 'নিতি পাস' (গিরিপথ) তিব্বতের রাস্তা। 'শেপুথারকেকে' আমরা, নিতি পাস' ছেড়ে দিলাম। এখানে আবার ধৌলিগঙ্গা পেরোতে হলো। এখানে নদীতে ব্রিজ নেই। দড়ি ঝুলিয়ে একটা রোপওয়ে করা হলো। শেরপারা রাস্তাটা বানালো। বাঁদরের মতো দড়িতে ঝুলে ঝুলে আমরা একে একে সবাই নদী পেরিয়ে গেলাম। খচ্চরগুলো অবশ্য নদীর জল দিয়েই পেরিয়ে গেল। খানিকটা এগিয়ে 'রাইকানা' নদীর ধারে আমাদের তাঁবু পড়লো। এখানে রাইকানা নদী ধৌলি গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। রাত কাটিয়ে পরদিন 30 তারিখ আবার হাঁটা।

বেলা থাকতেই আমরা বসুধারাতাল পৌঁছে গেলাম। বসুধারাতালে (লেকের) গভীর নীল জল। অনেক উঁচু পাহাড় থেকে বসুধারার পবিত্র জল ঝরঝর করে পড়ছে অবিরাম। এটাই আমাদের বেস ক্যাম্প রাইকানা ও পূর্বীকামেট হিমবাহ এখানে এসে মিশেছে।

বসুধারা তালে বেসক্যাম্পের উচ্চতা ছিল 15500 ফুট। এক নম্বরের উচ্চতা 16500 ফুট, দুনম্বর ক্যাম্পের উচ্চতা 17400 ফুট, তিন নম্বর 18600 ফুট, চার নম্বর 21200 ফুট এবং পাঁচ নম্বর ক্যাম্প হয় প্রায় সাড়ে বাইশ হাজার ফুট উঁচুতে। আমরা পেছনের দল এক নম্বর থেকে দুনম্বরে উঠে আসবার আগে ডাক্তার ও ফুরবাকে বেসক্যাম্পে নামিয়ে দিয়ে এলাম। আবার বেসক্যাম্প খোলা হলো। তবে এক নম্বর বন্ধ হয়ে গেল।

দুই ও তিন নম্বর ক্যাম্প চালু আছে। চার নম্বরের জন্য রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এমন সময় আবহাওয়া খুব খারাপ হয়ে গেল। তিন দিন ধরে অনবরত বরফ পড়লো। একটা মানুষহীন তাঁবু ও রান্নার জায়গাটা বরফে ঢেকে গেল। পালা করে রাত জেগে আমাদের তাঁবুটা বরফে ডুবতে দিইনি। হিমবাহের কোনও পাথর দেখা যাচ্ছিল না, সব সাদা। তিন দিন কোনও কাজ হলো না।

এক থেকে তিন নম্বর ক্যাম্প পর্যন্ত আমরা পূর্বীকামেট হিমবাহের মধ্যে থেকেছি। এরপর হিমবাহ ছেড়ে পাহাড়ের উপর উঠতে শুরু করেছি। খুবই কঠিন রাস্তা। শুধুই খাড়াই। রাস্তা এমনই বিপজ্জনক যে পাহাড়ের পাথর ও বরফের গায়ে স্থায়ী দড়ি (ফিক্সরোপ) লাগাতে হয়েছে ওঠানামা করার জন্য।

চার নম্বর ক্যাম্পটা করা হয়েছে একটা বরফের চাতালের উপর। চার থেকে পাঁচ নম্বরের রাস্তা আরও কঠিন ও বিপদসঙ্কুল। খানিকটা রাস্তা খাড়া পাথর ও বরফের দেওয়াল। ওই জায়গায় দুহাজার ফুটেরও বেশি রাস্তায় স্থায়ীভাবে দড়ি লাগাতে হয়েছে। দুদিন ফেরি দিয়ে পাঁচ নম্বর ক্যাম্প হলো। পাঁচ নম্বরে থাকবে শুধু মাত্র যারা শীর্ষারোহণ করবে এবং তাদের অভিযানে সাহায্য করবে। আমি আগেই চার নম্বর ক্যাম্প থেকে তিন নম্বরে নেমে এসেছি। দলনেতা উজ্জ্বল গাঙ্গুলি ও কোয়াটার মাস্টার সুশান্ত মজুমদার নিচে নেমে এলো। তিন নম্বর ক্যাম্পটিই প্রধান ক্যাম্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। উজ্জ্বলদা থেকে গেল। সুশান্ত বেস ক্যাম্পে নেমে গেল। অলোকদা ও বাণীদি আগেই বেসক্যাম্পে চলে গেছে। পাঁচ নম্বর ক্যাম্প থেকে আবিগামিন শৃঙ্গ অভিযান হবে। কামেটের জন্য আর একটি ক্যাম্প করা হবে।

19 সেপ্টেম্বর। রাত তিনটে নাগাদ শেরপারা উঠে পড়েছে। তাঁবুর ভেতর গ্যাস স্টোভ জ্বলছে। তাঁবুর

ক্যামেট শৃঙ্গে সুভাষ দাস, শেরপা কিকামি। ছবিট্টি তুলেছেন অপর আরোহী অতনু চ্যাটার্জী।

বাইরে থেকে বরফ কেটে গরম করতে বসানো হয়েছে। চা খেয়ে সবাই প্রস্তুত হচ্ছে। দিব্য মুখার্জি ও লাকপা শেরপা যাবে আবিগামিন অভিযানে। সুভাষ দাস, অতনু চ্যাটার্জি, কামিশেরিং ও কি কামি যাবে কামেটের পথে ছ নম্বর ক্যাম্পে। ওদের গায়ে পালকের তৈরি কোট, প্যান্ট, পায়ে ক্ল্যাম্বি বুট। বুটের উপর আবার ঢাকা রয়েছে সিন্থেটিক কাপড়ে। নিচে লাগানো হয়েছে 'ক্রাম্বন' (কাঁটা) যাতে বরফে পা পিছলে না যায়। কোমরে দড়ি বেঁধে দিব্য ও লাকপা এগিয়ে চলেছে। ওরা যখন তাঁবু ছেড়ে বের হলো তখন প্রায় ভোর হয় হয়।

অতনুরা একদিকে গেল দিব্যরা অন্যদিকে। নরম বরফে পা ডুবে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে পা তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন সকাল সাড়ে দশটা। ওঁরা পৌঁছে গেল আবিগামিনের মাথায়। কোমরের দড়ি খুলে পিঠের রুকস্যাগ থেকে জাতীয় পতাকা ও ক্লাবের পতাকা বার করে আইস-এক্সে লাগিয়ে আবিগামিনের মাথায় পুঁতে দিল। বরফ খুঁড়ে ক্যাডবেরি, খানিকটা কাজুবাদাম দিলো, ফলের রসের কৌট ফুটো করে খানিকটা রস ছড়িয়ে দিল। পুজো হলো আবিগামিনের। এটাই পাহাড়ের নিয়ম। আবিগামিনের পেছনটা খাড়া নেমে গেছে। ওদিকটা তিব্বত।

দু নম্বর ক্যাম্পে রাত কাটিয়ে অতনু-সুভাষরা 20 সেপ্টেম্বর ভোরে রওনা হলো কামেট চূড়ার দিকে। প্রথমে একটা দড়িতে অতনু ও কি কামি বাঁধা। পেছনে আর একটা দড়িতে সুভাষ ও কামি শেরিং। অতনুরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। নরম বরফে ওদের পায়ের দাগ স্পষ্ট। সেই চিহ্নে পা ফেলে ফেলে সুভাষরা এগিয়ে যাচ্ছে। খানিকটা যাওয়ার পর কামি শেরিং আর যেতে পারলো না। ওর জুতোয় বরফ ঢুকে যাচ্ছে। চিৎকার করে কামিকে দাঁড়াতে বললো। সুভাষের দড়ি খুলে দেয়। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে দড়ি ছাড়াই সুভাষ পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। ধীরে ধীরে পৌঁছে যায় অতনুদের কাছে। ওঁদের দড়ির সঙ্গে বেঁধে সুভাষ নিরাপদ করে নিজেকে। কামি দাজু নিচে নেমে আসে। ওঁরা এগিয়ে চলে। নরম বরফে হাঁটু ছাড়িয়ে বরফে পা ডুবে যাচ্ছে। শরীরের সমস্ত শক্তিকে উজাড় করে নরম বরফ ও প্রচণ্ড হাওয়ার সঙ্গে একনাগাড়ে ন'ঘণ্টা যুদ্ধ করে ওঁরা পৌঁছে যায় অভিষ্ট লক্ষ্যে। কামেটের মাথায় উড়িয়ে দেয় জাতীয় পতাকা ও হিমালয়ান অ্যাসো-সিয়েশনের পতাকা।

19 তারিখ চার নম্বর ক্যাম্পে কাটিয়ে দিব্য 20 তারিখ তিন নম্বরে নেমে আসে। 20 তারিখ ছ নম্বর ক্যাম্প থেকে যায় অতনু সুভাষরা। 21 সেপ্টেম্বর ওরা সবাই তিন নম্বরে নেমে আসে। এবার আমাদের ফেরার পালা।

C/o বর্তমান, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কল-16

বর্ণালী ও তার প্রয়োগ

অতীন অধিকারী

বর্ণালী সম্বন্ধে মোটামুটি জানলেও আজকের বিজ্ঞানে যে তার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে তা তোমাদের অজানা।

বর্তমান রচনাটিতে বর্ণালী, তার উপযোগিতা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলছি।

1666 খ্রীস্টাব্দে নিউটন সাদা আলোকরশ্মিকে একটি প্রিজমের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল এই সাত রঙের আলোকপটি লক্ষ্য করেন এবং তার নাম দেন বর্ণালী (Spectrum)। কিন্তু এই বর্ণালী ছিল অশুদ্ধ, কারণ নিউটন এর সাতটি রঙকে পরিষ্কারভাবে আলাদা আলাদা করে দেখতে পাননি। পরবর্তী কালে অবশ্য বিজ্ঞানীরা দুটি উত্তল লেন্স ব্যবহার করে শুদ্ধ বর্ণালী গঠন করতে সমর্থ হন, তার বিবরণ তোমরা অনেকেই নবম শ্রেণীর বইতে পড়েছ।

এপর্যন্ত তোমরা কেবল সূর্যালোকের বর্ণালী অর্থাৎ সৌর, বর্ণালীর সঙ্গেই পরিচিত। কিন্তু কেবল সূর্যালোক থেকেই নয়, বিভিন্ন যৌগের আলো থেকে বিভিন্ন ধরনের বর্ণালী পাওয়া যায়। পরে এগুলি আলোচনা করছি।

কোন যৌগিক উৎসের শুদ্ধ বর্ণালী গঠন এবং তার পর্যালোচনা যে যন্ত্রের সাহায্যে করা হয় তাকে বলা হয় বর্ণালীবীক্ষণ বা Spectroscope।

বিভিন্ন বস্তু যে বিভিন্ন বর্ণালী উৎপন্ন করে তাদের মোটামুটি ভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল—
(1) নিঃসরণ বর্ণালী (Emission Spectra) এবং
(2) শোষক বর্ণালী (Absorption Spectra)।

প্রথমে নিঃসরণ বর্ণালী নিয়ে আলোচনা করা যাক।

নিঃসরণ বর্ণালীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়— (1) নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী (Continuous Spectra), (2) পটি বর্ণালী (Band Spectra), (3) রেখা বর্ণালী (Line Spectra)। নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালীতে বর্ণালীর বর্ণগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি উজ্জ্বল পটির আকারে সাজানো থাকে। কিন্তু পটি বর্ণালীর ক্ষেত্রে এই বর্ণগুলি নিরবচ্ছিন্ন নয়। বৈদ্যুতিক আলোর বর্ণালী এবং নাইট্রোজেন গ্যাসের বর্ণালী যথাক্রমে নিরবচ্ছিন্ন ও পটি বর্ণালীর উদাহরণ। এবার আসা যাক রেখা বর্ণালীর কথায়। এই বর্ণালীতে এক বা একাধিক উজ্জ্বল রেখা থাকে এবং প্রতি দুটি রেখার মাঝে কিছু অন্ধকার জায়গা থেকে যৌগিক পদার্থের গ্যাস বা বাষ্পকে ভাস্বর করলে রেখা বর্ণালী উৎপন্ন হয়।

এবার শোষক বর্ণালীর (Absorption Spectra), কথায় আসি। শোষক বর্ণালীকে কালো রেখা বর্ণালী (Dark-line Spectra) এবং কালো পটি বর্ণালী (Dark band Spectra) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। কোন কঠিন পদার্থ থেকে নির্গত সাদা আলো যদি অপেক্ষাকৃত শীতল বাষ্পের ভিতর দিয়ে যায় এবং ঐ বাষ্প বা গ্যাস যদি আণবিক অবস্থায় থাকে তবে ঐ গ্যাস বা বাষ্প ভাস্বর হলে যে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ঐ বিকীর্ণ করতো, সেই সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ঐ গ্যাস বা বাষ্প সাদা আলো থেকে শোষণ করে নেবে। ফলে অতিক্রান্ত সাদা আলোর বর্ণালী নিরবচ্ছিন্ন হলেও এর শোষিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের জন্য মাঝে মাঝে কালো রেখা দেখা যাবে। এই ধরনের বর্ণালীকেই বলা হয় কালো রেখা বর্ণালী। আবার কঠিন পদার্থের সাদা আলো যদি অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুর ভিতর দিয়ে যায় এবং ঐ বস্তু যদি আণবিক অবস্থায় থাকে তবে ঐবস্তু ভাস্বর হলে যে সব বর্ণের পটি বিকীর্ণ করতো, সেই অংশ সাদা আলো থেকে যদি শোষণ করে, ফলে অতিক্রান্ত সাদা আলোর বর্ণালী নিরবচ্ছিন্ন হলেও এর শোষিত অংশের জন্য মাঝে মাঝে কালো পটি দেখা যাবে। এই ধরণের বর্ণালীকেই বলা হয় কালো পটি বর্ণালী।

বর্ণালী সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা হল, এবার বর্তমান বিজ্ঞানে বর্ণালীর প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

বিজ্ঞানে বর্ণালীর প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই মহাকাশ বিজ্ঞানে এর ভূমিকা সম্বন্ধে বলতে হবে। সূর্য ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের সম্বন্ধে বিশদ জানতে বর্ণালীতত্ত্ব খুব সাহায্য করে। আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ নিজের বৈশিষ্ট্যমূলক রেখা বর্ণালী গঠন করে। এই রেখা বর্ণালী মৌল পরমাণুর বৈশিষ্ট্য হওয়ায় কোন মিশ্রণে কি কি মৌলিক পদার্থ আছে তা রেখাবর্ণালী পর্যালোচনা করে সনাক্ত করা যায়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় বর্ণালী বিশ্লেষণ এবং এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন মিশ্রণ কোন মৌলেরও তাকে সনাক্ত করা সম্ভব। তাছাড়া বর্ণালীর বিশ্লেষণ দ্বারা পরমাণুর গঠন

বিন্যাস সম্পর্কেও আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। পৃথিবী থেকে বহু দূরে অবস্থিত সূর্য, নক্ষত্র, নীহারিকা প্রভৃতি রয়েছে। দেখা গিয়েছে যে, সূর্য ও নক্ষত্রের আবহমণ্ডলে অনেক পরিচিত মৌলিক পদার্থ, যেমন লোহা, ক্যালসিয়াম, তামা, হাইড্রোজেন ইত্যাদি বিদ্যমান। পৃথিবীতে এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে। বর্ণালী বিশ্লেষণ করে বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের আবহমণ্ডল সম্বন্ধে জানা গিয়েছে এবং দেখা গিয়েছে এখানে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি বিদ্যমান। বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে বিকীর্ণ আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা যুগ্মতারার অস্তিত্ব, এদের আবর্তনের অভিমুখ, নিজের অক্ষের চারিদিকে সূর্যের আবর্তনের অভিমুখ ও গতিবেগ, শনির বলয় সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

বিভিন্ন বড় বড় কারখানায় বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে অপদ্রব্যের (Impurities) অস্তিত্ব জানা যাচ্ছে। ধাতু-বিদ্যায় (Metallurgy) বর্ণালী বিশ্লেষণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, লৌহ, ইস্পাত অন্যান্য ধাতু গালাই-এর কাজে কিছু পরিমাণ অপদ্রব্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। সঠিক পরিমাণে এরা আছে কিনা, তা বর্ণালী বিশ্লেষণের দ্বারা জানা যায়। এইভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ণালীতত্ত্বের অবদান লক্ষ্য করা যায়।

পোস্ট—পূর্ব দক্ষিণ ময়না, জেলা—মেদিনীপুর, পিন—721620

বিজ্ঞানীদের টুকিটাকি

তিন : আইনস্টাইন

একবার এক মহিলা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কথাচ্ছলে ঐ মহিলা একদিন আইনস্টাইনকে বলেন, "আপনার 'আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব' আমাকে একটু সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন ?"

উত্তরে আইনস্টাইন একটি গল্প বলেন। গল্পটি এই রকম : এক গ্রীষ্মের দিনে আমার দেশের এক অন্ধ বন্ধুর সঙ্গে আমি হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। দিনটা খুবই গরম ছিল, তাই আমি বললাম, 'এ সময় এক গেলাস করে ঠাণ্ডা দুধ পান করলে বেশ ভাল হতো।'

তাই শুনে অন্ধ বন্ধুটি বললেন, 'দুধ ! সে আবার কেমন জিনিস ?'

আমি বললাম, 'দুধ হলো সাদা রঙের তরল পদার্থ।'

বন্ধু বললেন, 'তরল পদার্থ কি, তা আমি জানি, কিন্তু সাদাটা কি ?'

উত্তরে আমি বললাম, 'রাজহাঁসের পালকের রঙ'।

অন্ধ বন্ধুটি বললেন, 'পালক তো জানি, কিন্তু রাজহাঁসটা কি ?'

আমি বললুম, 'রাজহাঁস হলো একরকম পাখি, যার গলাটা বাঁকা।'

বন্ধু বললেন, 'গলা জানি, কিন্তু বাঁকা কি ?'

—একথা শুনে আমি তখন ধৈর্য হারালাম। বন্ধুর একখানি হাত টেনে সোজা করে ধরে বললাম, 'একে বলে সোজা।' তারপর বন্ধুর সেই হাতটিকেই তাঁর কনুই-এর কাছে টেনে বেঁকিয়ে দিয়ে বললাম, 'এটা হলো বাঁকা।'

অন্ধ বন্ধুটি অতঃপর বললেন, 'এইবার বুঝেছি দুধ কি জিনিস !'

চার : মাইকেল ফ্যারাডে

লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটুশনের গবেষণাগারে একদা এক বিদেশী বিজ্ঞানী গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন যে জীর্ণ পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি নিবিষ্টচিত্তে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর কাজ লক্ষ্য করছেন। তাই দেখে যুবক গবেষকটি জীর্ণ পোশাক পরিহিত ভদ্রলোকটির কাছে গিয়ে শুধালেন, 'আপনি বোধহয় এখানে অনেক বছর ধরে আছেন, তাই না ?'

—হ্যাঁ, তা বেশ কয়েক বছর আছি।

: সম্ভবতঃ এখানে তত্ত্বাবধায়কের কাজ করেন ?

: —হ্যাঁ, প্রায় সেইরকমই বলতে পারেন।

: মনে হয় এখানে মোটামুটি ভালই বেতন পান ?

—হ্যাঁ, তবে আরও কিছু বেশি বেতন আশা করেছিলাম।

: আচ্ছা, আপনার নামটা কি জানতে পারি ?

: —অবশ্যই। আমার নাম 'মাইকেল ফ্যারাডে'।

যুবক গবেষক তখন বিষম অপ্রস্তুতে পড়ে মাইকেল ফ্যারাডের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। বললেন, 'মাফ করবেন আমি আপনাকে চিনতেই পারিনি।'

হ্যাঁ, মাইকেল ফ্যারাডে অমনি সাদাসিধে বেশভূষাতেই থাকতেন।

অমরনাথ রায়

হিলিয়াম

অমরনাথ রায়

1868 খ্রীস্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্বিদ জে. জেনসন এবং ইংরেজ জ্যোতির্বিদ এন লকইয়ার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের উপরভাগের (ক্রোমস্ফিয়ার) বর্ণালী বিশ্লেষণের সময় হলুদ রঙের একটি রেখা লক্ষ্য করেন। ইটালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী এ. সেসি (A. Secci) সৌর বর্ণালীর হলুদ রঙের ঐ রেখাটির নাম দেন D_3। সেটি লক্ষ্য করে জেনসন ও লকইয়ারের ধারণা হয় যে সৌর বর্ণালীর এই নতুন রেখাটি সম্ভবতঃ কোন অজানা মৌলের হবে। লকইয়ার নব-আবিষ্কৃত মৌলটির নাম রাখলেন 'হিলিয়াম'। HELIC অর্থাৎ সূর্য থেকে হিলিয়াম নামটি রাখা হলো। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে ট্যাঁকশালে একই ডিজাইনের অনেক নতুন মেডেলও প্রস্তুত করা হলো।

1875 খ্রীস্টাব্দ।

ইংরেজ রসায়নবিদ স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম এর আকরিক 'ক্লেভাইট' হতে উদ্ভূত একটি গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। এই গ্যাসকে উত্তপ্ত করে তা থেকে নিঃসৃত আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করবার সময় র‍্যামজে অবাক হয়ে গেলেন। সৌর রশ্মিতে লকইয়ার যে বর্ণরেখা লক্ষ্য করছিলেন, এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ বর্ণরেখা লক্ষ্য করলেন র‍্যামজে।

একই সময়ে পি ক্লেভ নামে জনৈক সুইডিশ বিজ্ঞানী যাঁর নাম অনুসারে 'ক্লেভাইট' আকরিকের নামকরণ করা হয়েছে, ঘোষণা করলেন যে ক্লেভাইট আকরিক থেকে পার্থিব হিলিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু পি. ক্লেভ-এর ঘোষণায় দেরী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে 1875 সালের 29শে মার্চ তারিখে ক্রুক্স কর্তৃক সম্পাদিত 'কেমিক্যাল নিউজ' পত্রিকায় র‍্যামজে পার্থিব হিলিয়াম আবিষ্কারের তত্ত্ব বিশদভাবে লিখে প্রকাশ করে ফেললেন। বলাবাহুল্য, পার্থিব হিলিয়াম আবিষ্কারের কৃতিত্ব বর্তালো স্যার উইলিয়ম র‍্যামজের উপর। 1898 খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে হিলিয়াম-এর অস্তিত্ব ধরা পড়লো। পরবর্তীকালে পিচব্লেণ্ড, ফারেনহাইট, মোনাজাইট এবং বেরিল খনিজগুলিতেও হিলিয়ামের অস্তিত্ব ধরা পড়লো। আমেরিকা ও কানাডার পেট্রোলিয়ম কূপের প্রাকৃতিক গ্যাসেও আয়তন হিসাবে শতকরা একভাগ হিলিয়াম পাওয়া গেলো। ভারতের ত্রিবাঙ্কুরের সমুদ্রতটে যে মোনাজাইট বালুকণা আছে, তাতেও গ্রাম প্রতি এক কিউবিক সেণ্টিমিটার হিলিয়াম মিললো। এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে প্রায় 135 গ্রাম হিলিয়াম উদ্ধার করা হলো। এ ছাড়া মিনারেল ওয়াটারে এবং আগ্নেয়গিরি হতে নিঃসৃত গ্যাসে হিলিয়ামের সন্ধান মিললো। উটাহ (UTAH) নামক জায়গায় পৃথিবীর বিখ্যাত হিলিয়াম কূপের অস্তিত্ব ধরা পড়লো। এমনকি ভারতের বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণেও হিলিয়াম মিললো!

এ ভিন্ন যে তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে আলফা কণা বের হয় তার থেকেও হিলিয়াম পাওয়া গেল। লিথিয়াম ও বোরনের উপর তীব্রগতিসম্পন্ন প্রোটন বা আলফা কণার আঘাতে হিলিয়াম উৎপন্ন করা সম্ভব হলো। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রতি দশলক্ষ ভাগে মাত্র পাঁচভাগ হিলিয়াম-এর অস্তিত্ব ধরা পড়লো। দেখা গেল যে ভূত্বকে $3\times10^{-7}\%$ হিলিয়াম আছে।

এমনিভাবে পর্যায় সারণীর 2 নম্বর মৌলটি, যার অস্তিত্ব প্রথম মিলেছিল সৌররশ্মির বর্ণালীতে, অনেক দিন ধরে অনেক বিজ্ঞানীর চেষ্টায় পৃথিবীর বুকেও তার অস্তিত্ব মিললো।

আবিষ্কারের পর হিলিয়াম মৌলটির ধর্মাবলী বিজ্ঞানীরা চট্‌পট্‌ আবিষ্কার করে ফেললেন। তার ব্যবহারও জেনে ফেললেন। এবার সে সব কথায় আসি।

হিলিয়ামের চিহ্ন হলো He, পরমাণু ক্রমাঙ্ক = 2, পারমাণবিক গুরুত্ব = 4·0056, ^4He নামক হিলিয়ামের আইসোটোপ বা সমস্থানিকটির স্ফুটনাংক = $-269·1°C$। বলাবাহুল্য যে হিলিয়ামের চারটি সমস্থানিকের মধ্যে প্রাকৃতিক হিলিয়াম ^4He দ্বারা গঠিত। এর অন্যান্য সমস্থানিকগুলি হলো যথাক্রমে $^3H.$, ^5He, ^6He। এর মধ্যে 5 এবং 6 ভরসংখ্যাবিশিষ্ট হিলিয়ামকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করতে হয়।

হিলিয়াম বর্ণহীন, গন্ধহীন, গ্যাসীয় মৌল। এর একটি অণুতে একটিমাত্র পরমাণু আছে, তার মানে মৌলটি এক-পরমাণুক। বিশ্বের পরমাণু জগতে শতকরা নয় ভাগেরও বেশি হলো হিলিয়াম। একে হিলিয়াম লঘুভার মৌল, তার উপর এর পরমাণুগুলির দ্রুত গতির দরুন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল তাদের ধরে রাখতে পারে না। তাই পৃথিবীতে হিলিয়াম এক দুর্লভ মৌল। মৌলটি অদাহ্য। আর সব মৌলের মধ্যে হিলিয়ামের গলনাংক ও স্ফুটনাংক সবচেয়ে কম। আবার সকল পরিচিত গ্যাসের মধ্যে হিলিয়াম সবচেয়ে কম দ্রবণীয়। 1000 কিউবিক সেণ্টিমিটার জলে মাত্র 8·8

আয়তন হিলিয়াম দ্রবীভূত হয়। 1908 সালে বিজ্ঞানী 'ওনেস' (ONNES) হিলিয়ামকে প্রথম তরলে পরিণত করেন। তারপর 1926 সালে লিডেন (LEIDEN) এবং কেওসোম (KEOSOM) নামে দুই বিজ্ঞানী কঠিন হিলিয়াম প্রথম প্রস্তুত করতে সমর্থ হন।

সেলসিয়াস, ফারেনহাইট ও রোমার ছাড়া উষ্ণতা মাপার আরেকটি স্কেল আছে। তার নাম পরম স্কেল (Absolute Scale)। সেলসিয়াসকে যেমন C চিহ্ন দিয়ে এবং ফারেনহাইটকে F চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়, তেমনি পরম উষ্ণতা বোঝাতে K চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

2·3°K উষ্ণতায় হিলিয়াম এক অস্বাভাবিক ধর্ম অর্জন করে। তখন এক একটি বিশেষ নামে অভিহিত হয় এবং নামটি হলো He (II) অর্থাৎ কিনা 'দ্বিতীয় হিলিয়াম'। এই দ্বিতীয় হিলিয়ামকে বলা হয় 'সুপারফ্লুইড' অর্থাৎ অতি তরল পদার্থ। এর সান্দ্রতা তখন থাকে না। ক্ষুদ্র গর্তে বাতাস ঢুকতে পারে না। He (II) তার ভেতর দিয়েই পথ করে নিতে পারে। একমুখ খোলা একটি কাচের টিউবকে He (II)-এর মধ্যে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রাখলে দেখা যাবে যে He (II) ঐ টিউবের গা বেয়ে উঠে আসছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই টিউবের বাইরের এবং মধ্যের He (II) এর তল একই উচ্চতায় চলে এসেছে। তামার চেয়ে He (II)-এর তাপ পরিবহন ক্ষমতা প্রায় পঁচিশগুণ বেশি। বলা বাহুল্য 2·3°K উষ্ণতার নীচে তরল হিলিয়ামের এই সব ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। তখন তাকে বলা হয় He (I)।

হাল্কা ও দাহ্য নয় বলে হিলিয়াম গ্যাসকে বেলুনে ভরা হয়। হিলিয়াম ও অক্সিজেনের মিশ্রণ, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণের চেয়ে হাল্কা। হিলিয়াম নিষ্ক্রিয় গ্যাস, রক্তে নাইট্রোজেনের চেয়ে কম দ্রাব্য এবং হিলিয়াম রক্ত থেকে তাড়াতাড়ি ব্যাপিত হয়। তাই অধিক চাপে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে হিলিয়াম ও অক্সিজেনের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। এ ভিন্ন থার্মোনিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় এবং গ্যাস থার্মোমিটারেও হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

সংগ্রহ সূত্রঃ 1. মহাবিশ্বের মৌল উপাদান—আইজাক এসিমোভ। 2. একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ—কানাইলাল মুখোপাধ্যায়। 3. Chemical elements—How they were discovered: D. N. Trifonov and V. D. Trifonov. 4. A Text Book of H. S. Chemistry: P. K. Dutt.

খড়্গপুর, মেদিনীপুর

জ্ঞানবিজ্ঞানের বই

বিজ্ঞানের সহজ পাঠ ॥ সুধাংশু পাত্র ॥ দে'জ পাবলিশিং ॥ দাম 12 টাকা

সেই কোন্ আদ্যিকালে মানুষ আবিষ্কার করেছিল চাকা। প্রয়োজনের তাগিদেই চাকা আবিষ্কৃত হয়েছিল। চাকাকে মানুষ লাগালো গাড়ির তলায়। তাতে গাড়ির চলাচলে সুবিধা হলো। চাকার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম গাড়িরও বিবর্তন ঘটতে থাকলো। মানব সভ্যতায় গতি এনে দিল চাকা ও হরেক রকম যানবাহন। প্রথম প্রথম গাড়ি চলতো মেঠো পথে। তারপর সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নির্মিত হলো রাজপথ, নদীর উপর নির্মিত হলো সেতু। গাড়ি চললো গড়গড়িয়ে সড়ক পথ ধরে। বিবর্তন ঘটতে লাগলো গাড়িরও। গোরুর গাড়ি সাইকেল, রেল্‌গাড়ি, মোটর গাড়ি এলো একে একে। মাটি ছেড়ে আকাশে উড়বার যান উড়োজাহাজ নির্মিত হলো। মানুষের আশা তাতেও মিটলো না। আকাশ থেকে মহাকাশে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পাড়ি জমাবার জন্যে নির্মিত হলো রকেট।

অতীতে কাজ করবার জন্যে মানুষ ব্যবহার করতো দৈহিক শক্তি। তারপর শক্তির উৎসরূপে মানুষ একে একে ব্যবহার করতে লাগলো বাষ্পশক্তি, জলশক্তি, সৌরশক্তি, তড়িৎশক্তি ও পারমাণবিক শক্তি।

আবার অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের জন্যে আগুন জ্বালাতে শিখলো। এলো প্রদীপ, মোমবাতি, কেরোসিন বাতি, কোলগ্যাসের বাতি এবং সবশেষে বৈদ্যুতিক বাতি।

সুতী বস্ত্র, রেশমীবস্ত্র ও পশমী বস্ত্রের চলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পোষাক পরিচ্ছদেও এলো পরিবর্তন। বিজ্ঞান কিন্তু থেমে রইলো না। রাসায়নবিদেরা প্রস্তুত করলেন কৃত্রিম রসায়নিক তন্তু। সেই তন্তু দিয়ে প্রস্তুত হতে লাগালো নাইলন বস্ত্র, টেরিলিন বস্ত্র। ধীরে ধীরে সুতি ও রেশমী বস্ত্রের চাহিদা কমতে থাকলো এবং শক্ত, টেঁকসই ও রেশমের মতো চিক্কন কৃত্রিম রাসায়নিক তন্তু দ্বারা তৈরি বস্ত্রে বাজার ছেয়ে গেলো।

এ সব বিষয়ের কথাই সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন এ বছরের "কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান" পুরস্কারে ভূষিত প্রখ্যাত বিজ্ঞান লেখক সুধাংশু পাত্র মহাশয় তাঁর বিজ্ঞানের সহজ পাঠ গ্রন্থে। ছোটদের জন্যে লেখা হলেও বড়রাও লাভবান হবেন এ গ্রন্থ পাঠে।

—অমরনাথ রায়

বুদ্ধি শুদ্ধি

রক্তারক্তি চলবে না

ধাঁধা বুদ্ধিশুদ্ধির একটা ভালো হাতিয়ার। একটু বুদ্ধিতে শান দেওয়া আর কি। একটি প্রচলিত ধাঁধা নিয়ে আলোচনা করি।

তোমরা হয়ত কেউ কেউ জানো সেই অদ্ভুত ডিম বিক্রির ঘটনাটা।

এক ডিমওয়ালার কাছে প্রথম খদ্দের এসে বলল— "তোমার কাছে যতগুলো ডিম আছে তার অর্ধেক সংখ্যক ডিম এবং আধখানা ডিম আমি কিনতে চাই।" ডিমওয়ালা তাই দিল। দ্বিতীয় খদ্দের এসেও তখন যতগুলো ডিম ছিল তার অর্ধেক এবং আধখানা ডিম কিনল। ডিমওয়ালার কাছে আর মাত্র একটি ডিম রইল। প্রথমে কতগুলো ডিম ছিল?

তোমরা যারা জানো না তারা হয়ত ভাবছ কিভাবে ডিম ভেঙে আধখানা করে বিক্রি করা সম্ভব। যারা জানো তারা হাসছ। কেননা ডিম এখানে না ভেঙে সুন্দরভাবে গোটা ডিম বিক্রিই ত হয়েছে। কটা ডিম প্রথমে ছিল তা বার করতে পিছন থেকে হিসেব করে আসতে হবে। দ্বিতীয় খদ্দের ডিম কেনার পর একটি গোটা ডিম আছে মানে দ্বিতীয় খদ্দের কেনার আগে ডিম ছিল তিনটি। 3-এর অর্ধেক $1\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=2$টি ডিম দ্বিতীয় খদ্দের কিনেছিল। প্রথম খদ্দের কেনার পর অবশিষ্ট ছিল 3টি মানে কেনার আগে ছিল 7টি। প্রথম খদ্দের কিনেছিল 7-এর অর্ধেক $3\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=4$টি।

প্রায় এরকমই আর একটি ধাঁধা দিই। তবে সমস্যাটা আগের মত সহজে সমাধান হবে না কিন্তু।

একটি ছেলে পায়রা পোষে। তা হয়েছে কি তার পায়রার বাচ্চা-টাচ্চা হয়ে সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেছে। এখন সে ঠিক করেছে কিছু পায়রা বিক্রি করে দেবে। আর বিক্রির ধরনও আগের মতই উদ্ভট। তবে হ্যাঁ কোন রক্তারক্তির ব্যাপার নেই এখানে সেটা ত তোমরা জেনেই গেছ। কিভাবে বিক্রি করছে দ্যাখো চার দফায়।

1. মোট পায়রার অর্ধেক এবং আধখানা পায়রা।
2. অবশিষ্ট পায়রার তিন ভাগের এক ভাগ এবং এক-তৃতীয়াংশ পায়রা।
3. অবশিষ্ট পায়রার চার ভাগের এক ভাগ এবং সিকি পায়রা।
4. অবশিষ্ট পায়রার পাঁচভাগের একভাগ এবং এক-পঞ্চমাংশ পায়রা।

এখন ছেলেটির কাছে 11টি পায়রা আছে। প্রথমে কতগুলি পায়রা ছিল? এতো সোজা হিসেব। পারবে না? না পারলে পরের সংখ্যায় দেখে নিও।

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

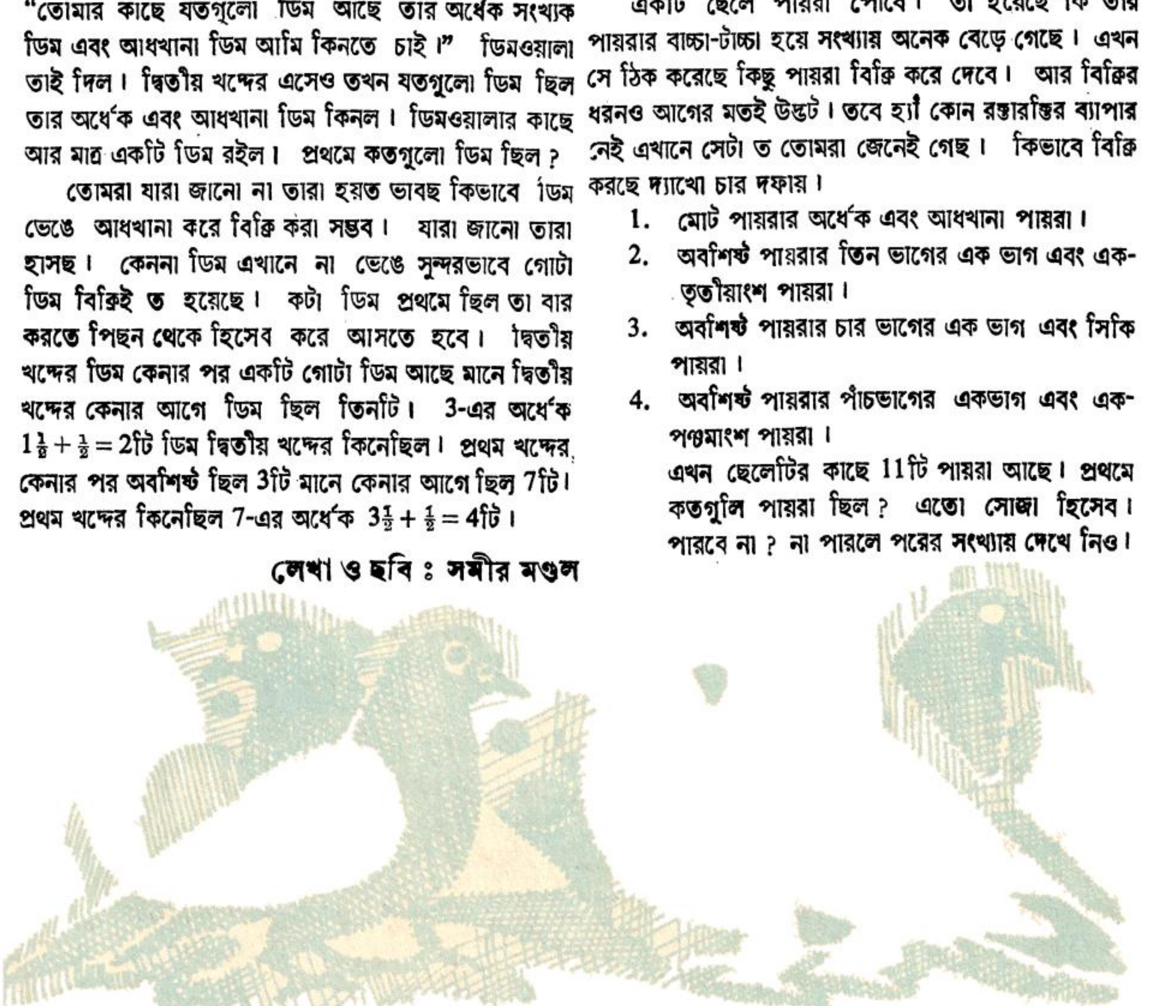

জোর ধাক্কা—উত্তর

তুমি কি ভেবেছ এখন আগের চেয়ে তিন ভাগের এক ভাগ সময়েই সমস্ত শহর জানাজানি হবে? তাহলে কিন্তু ভুল ভেবেছ। আসলে এবারও উত্তর হবে ঐ একই অর্থাৎ রাত সাড়ে সাতটা।

প্রথমে বলা হয়েছে প্রথম আধ ঘণ্টার শেষে তিনজন লোক খবরটা জানে। শেষের প্রশ্নটা ঠিক এইখান থেকে শুরু। অর্থাৎ আধঘণ্টা সময় শুধুমাত্র শুরুতে বাঁচলো। প্রথম আধঘণ্টার শেষে তিনজন না হয়ে শুরুতে তিনজন। অতএব মোট সময়ে ঐ আধঘণ্টাই কমবে এবং উত্তর হবে রাত সাড়ে সাতটা।

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

VII-VIII জুন 87

1. বেড়ালের মুখের গোঁফকে কি বলে ?

2. 'কৌটিল্য' কি জন্য বিখ্যাত ছিলেন ?

3. রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর নাম কি ছিল ?

4. আলোকের বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ফলে কি রকম আলোক উৎপন্ন হয় ?

5. চাপ কমালে তরলের স্ফুটনাংক বাড়ে, না কমে ?

6. কলকাতায় কটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ?

7. মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বড় দেশ কোনটি ?

8. ফুটবল খেলায় FIFA কথার সম্পূর্ণ অর্থ কি ?

9. ব্রডগেজ রেলপথ কতোটা চওড়া ?

10. এটা কিসের ছবি ?

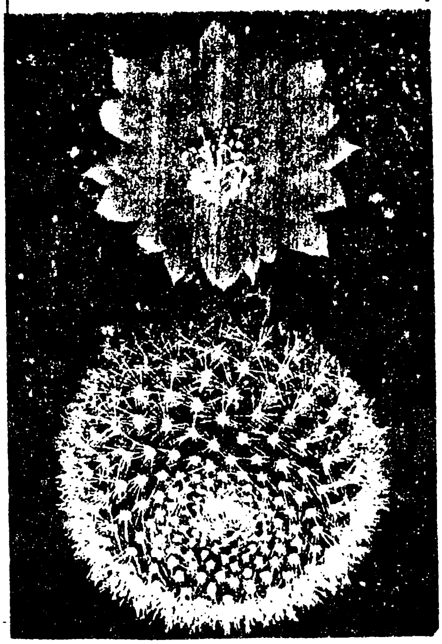

গ্রেড II

IX-X জুন '87

1. 'আঙকোরভাট' এর মন্দির কে নির্মাণ করিয়েছিলেন ?

2. পৃথিবীর পরিক্রমণ গতিবেগ কতো ?

3. অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে কি ধরনের শ্বসন চলে ?

4. ভিটামিন E-এর অভাবে শিশুদের কোন্ রোগ হয় ?

5. একক সময়ে বেগ বৃদ্ধির হারকে কি বলে ?

6. এক হর্স পাওয়ার = কতো ওয়াট ?

7. ওহ্‌ম-সেন্টিমিটার কিসের একক ?

8. নিচের কোন্‌টি তড়িৎযোজী যৌগ ?

(ক) Mgo (খ) PH_3 (গ) Hcl

9 ভুট্টা বীজের একদিকে লম্বালম্বি বিস্তৃত যে উঁচু অংশটি থাকে, তার নাম কি ?

10. এ মাছের নাম কি ?

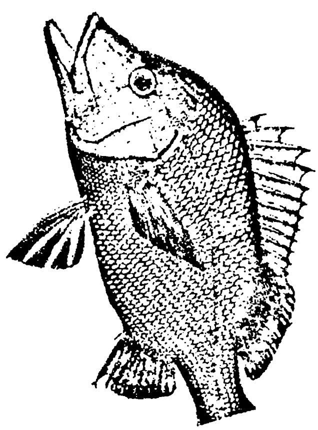

গ্রেড III

XI-XII জুন '87

1. নিকেল, লোহা ও ক্রোমিয়াম মিশ্রিত ধাতু-সংকরের নাম কি ?

2. 'করকোরস ক্যাপসুলারিস' উদ্ভিদ থেকে কি উৎপন্ন হয় ?

3. প্রাণিবিজ্ঞানে কুকুরের বিজ্ঞান সম্মত নাম কি ?

4. একটি সোডিয়াম অণুতে কয়টি পরমাণু থাকে ?

5. 'হোমোজাইগাস' কাকে বলে ?

6. মেণ্ডেলের প্রথম সূত্রের নাম কি ?

7. মানবদেহের দীর্ঘতম গ্ল্যাণ্ডটির নাম কি ?

8. INSAT—IB এর একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে কতো সময় লাগে ?

9. নিচের কোনটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি ? (ক) এক্সরশ্মি (খ) গামা রশ্মি (গ) ইনফ্রারেড রশ্মি

10. ইনি একজন বিখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী।—এঁর নাম কি ?

শব্দকূট

রাম প্রসাদ সরদার

সংকেত—পাশাপাশি

2. গ্রাহাম বেল আবিষ্কার করেন।
4. লুই ভাগের আবিষ্কার করেন।
5. জগদীশ চন্দ্র বসু আবিষ্কার করেন।
8. **আইজ্যাক নিউটন আবিষ্কার করেন যে তত্ত্ব।**
10. **দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক।**

সংকেত—উপর নিচ

1. 1608 সালে হল্যাণ্ড বিজ্ঞানী লিপার্সি আবিষ্কার করেন।
3. স্যামুয়েল মর্স আবিষ্কার করেন।
6. রেনী লেনেক আবিষ্কার করেন।
7. জে. জে. টমসন আবিষ্কার করেন।
9. 1923 সালে পদার্থ বিদ্যায় নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী।

সমাধান পরবর্তী সংখ্যায়

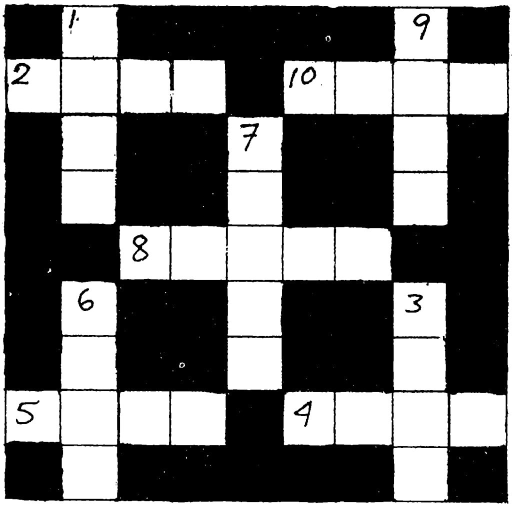

আই কিউ টেস্ট

জুন 1987

1. ক্লাসে হরি কোন একটি পরীক্ষায় রামের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। শ্যামল হরির চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। কে সব থেকে কম নম্বর পেয়েছে?
   (a) হরি, (b) রাম, (c) শ্যামল।
2. কোন দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে কোন্ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে—
   (a) দেশের জনগণ সম্পদশালী হচ্ছে।
   (b) দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটছে।
   (c) দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি।
   (p) দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
3. নিচের উল্লেখ করা কাজগুলির মধ্যে কোনটিতে পরিবর্তী প্রবাহ ব্যবহার করা যায় না—
   (a) তাপন, (b) আলোকন, (c) বিভব পরিবর্তন, (d) তড়িৎ লেপন।
4. বিশুদ্ধতম লোহা কোনটি—
   (a) পিগ আয়রন, (b) রট আয়রন, (c) কাস্ট আয়রন।
5. ভারতের কোন রাজ্যে 'গিড্ডা' নাচ প্রচলিত—
   (a) অরুণাচল, (b) পাঞ্জাব, (c) হরিয়ানা, (d) হিমাচল প্রদেশ।

কুইজ কনটেস্ট সমাধান

সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট

এপ্রিল '87 সংখ্যার সমাধান

1. সিউল। 2. পাঞ্জাব। 3. গোল্ড কোস্ট। 4. আসামে, গৌহাটির কাছে। 5. তামা। 6. লেড। 7. র‍্যামজে এবং ট্রেভারস্। 8. পরিফেরা। 9·45 × 10^{12} কিলোমিটার। 10. 24টি। 11. লোহার 12. পোলো। **এপ্রিল সংখ্যার ফটো ক্যুইজের সমাধান**

ফ্লোরিডা ম্যানাটি

এপ্রিল '87 জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

1. নিউ ইয়র্ক। 2. আমেরিকা। 3. পদ্মফুল। 4. মাওরি। 5. আলু। 6. 14 থেকে 16 টি। 7. বিষ্ণু শর্মা। 8. রাজস্থান। 9. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 10. জলাতঙ্ক। 11. $\frac{\pi}{2}$ রেডিয়ান। 12. 1917 সালে। **এপ্রিল সংখ্যার জুনিয়র ফটো ক্যুইজের সমাধান :- হংসচঞ্চু প্লাটিপাস**

আই কিউ টেস্ট সমাধান

এপ্রিল '87 আই-কিউ-টেস্টএর সমাধান

1. $\frac{1}{11}$ অংশ। 2. (b) জন অ্যাডামস। 3. (c) রাবার। 4. (c) 10। 5. (b) ভারত, 1952 সালে।

শব্দকূট সমাধান

দাস,। **বর্ধমানঃ** ফারাহদিবা. সংহিতা দাস, সোনালী বিশ্বাস, প্রসেনজিৎ দাস, পার্থ হাজরা, গার্গী পাণি, সোমা মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ দাঁ, তমাল সাহা। **মেদিনীপুর ঃ** জয়ন্ত দত্ত মজুমদার, বিশ্বনাথ ভৌমিক, ওঁকার দাশ, আল্পনা জানা। **নদীয়া ঃ** জীবিতেশ পাল, দেবশ্রী চক্রবর্তী, অসীমা বিশ্বাস। **মুর্শিদাবাদ ঃ** চম্পক অধিকারী। **বীরভূম ঃ** অলোক কুমার চক্রবর্তী। **বাঁকুড়া।** শমিতা দাস, অয়ন কর্মকার, রূপাঞ্জন সাহা। **মালদহ ঃ** মানসী হাজরা চৌধুরী। **পঃ দিনাজপুর ঃ** অঞ্জনা মিত্র। **ত্রিপুরা—কৈলাশহর ঃ** হিমাদ্রি নাথ।

এপ্রিল 87-এ প্রকাশিত সিনিয়র ফোটো ক্যুইজ-এর সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **প্রলয় কান্তি ডাকুয়া** প্রযত্নে, রথীন্দ্রনাথ ডাকুয়া, পোস্ট - মাথাভাঙ্গা, জেলা—কোচবিহার। 2. **দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য** প্রযত্নে, দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, গ্রাম + পোস্ট—বেথুয়াডহরি জেলা—নদীয়া।

এপ্রিল 87-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **দীপ্তনীল সেনগুপ্ত** 6, চারুচন্দ্র প্লেস ইস্ট কলকাতা—700033
2. **রত্না দত্ত** প্রযত্নে, গোরাচাঁদ দত্ত গ্রাম + পোঃ—বিরহী জেলা—নদীয়া
3. **মালবিকা সিংহ,** স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া

এপ্রিল ঃ '87-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ অরূপ মাজী, অপ্রতিম গুহ, অয়ন কুমার মুখার্জী, সুমিতা ভাণ্ডারী, স্ফীত দে, কঙ্কোলী রায়, মুকুলেশ দেবনাথ, সুপর্ণা দত্ত, কাজল ভট্টাচার্য, তাংকু কুণ্ডু, দেবলা ব্যানার্জী, রূপক দাস, মঞ্জুষা গুহ, ঐষিক মজুমদার। **24-পরগনা ঃ** অঞ্জন সেনগুপ্ত, সন্দীপ মুখার্জী, প্রতীক কুমার করণ, সোমা ভট্টাচার্য, ভাস্কর মণ্ডল, মিঠু ঘোষ, নবকুমার গুহ, অনাদি বিশ্বাস, কমলেশচন্দ্র সাহা, সন্দীপ চক্রবর্তী, সোমনাথ বল। **হাওড়া ঃ** অংশুক চক্রবর্তী, গৌতম পাত্র, জ্যোতির্ময় মান্না, রমারানী অধিকারী, সৌম্যপ্রতিম মণ্ডল, ডরোথি ঘোষ। **হুগলী ঃ** মল্লিকা ধর, রাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ শর্মা, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুমন ভড়, জলি সাহা, ইন্দ্রজিৎ, দত্ত, প্রবাল চ্যাটার্জী, শুভ্রদীপ দাস, শুভ্রা মোদক।

বর্ধমান ঃ কাকলি আশ, মাধব ঘোষদস্তিদার, চন্দ্রা রায় বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়িতা ভদ্র, তাপস ঘোষ, মনোজ মারেঠী, ঋত্বিক লাহা, বাপ্পাদিত্য চৌধুরী, অন্তরা সেন, শ্যামলেন্দু পাত্র, রক্তিম মুখার্জী, কুন্তল রায়, দোলন গুপ্ত, শুভ্রাংশু ভৌমিক, চিন্ময় চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ দাঁ, উৎপল ঘোষ, কুমকুম সরকার, প্রসেনজিৎ দাস, মহুয়া পট্টনায়ক, অভিজিৎ গোস্বামী, সোনালী বিশ্বাস, সুতপা ভট্টাচার্য, সংহিতা দাস। **মেদিনীপুর ঃ** কথিকা বায়েন, মহঃ ফিরোজ বিশ্বাস, দেবানন্দ জানা, মৌসুমী ঘোষ, অতনু দাশ, বিশ্বনাথ ভৌমিক, সীমা গুছাইত, জয়ন্ত দত্ত-মজুমদার, বিকাশ কুমার মণ্ডল, এণাক্ষী গোস্বামী। **নদীয়া ঃ** সুমন দাস, সুমন সেনগুপ্ত, রিংকু বিশ্বাস, অনির্বাণ অধিকারী, সুব্রত কুমার বিশ্বাস, অচিন্ত্যকুমার বিশ্বাস, কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য। **মুর্শিদাবাদ ঃ** চম্পক অধিকারী। **বীরভুম ঃ** প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবব্রত ঘোষ। **বাঁকুড়া ঃ** শুদ্ধকল্যাণ পাল, উত্তরা ঘোষ, কৌস্তুভ আচার্য। **পুরুলিয়া ঃ** কৃষ্ণা কর্মকার, **মালদহ ঃ** নিবেদিতা দত্ত, উদয় কুমার মণ্ডল। **পঃ দিনাজপুর ঃ** সুরজিৎ রায়, শিবাজী সরকার, অপর্ণা দাশ। **আসাম ঃ** ডিব্রুগড় ঃব্রতীশ কান্তি দাশ **কাছাড় ঃ** পল্লব নাথ। **ত্রিপুরা ঃ—কৈলাশহর ঃ** হিমাদ্রি নাথ।

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

মে 87 সংখ্যা থেকে ক্যুইজ কনটেস্ট তিনটি পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। VII VIII; IX ও XI-XII। ফটো ক্যুইজ আলাদা ভাবে থাকছে না।

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

মে সংখ্যার ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড—1

অমরনাথ রায়ের

সংখ্যা নিয়ে খেলা

গ্রেড—2

পার্থসারথিচক্রবর্তীর

বুদ্ধি নিয়ে খেলা

গ্রেড—3

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—গ্রেড-1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..

....

ঠিকানা ....

....

বয়স.................. শ্রেণী ....

বিদ্যালয়ের নাম..........................

....

....

আই কিউ টেস্ট/ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এ উত্তর পাঠালাম।

অডিও অ্যামপ্লিফায়ার / শুভাশিস বিশ্বাস

আজকাল রেকর্ডপ্লেয়ারের সঙ্গে একটি মেশিন ব্যবহার করা হয় তাতে শব্দ খুব জোর হয় এবং শব্দ ইচ্ছামতন (তীক্ষ্ণ ও গমগমে আওয়াজ) কমানো ও বাড়ানো যায়।

রেকর্ড প্লেয়ার ছাড়া Pick up থেকে মাইক্রোফোন অথবা একটা স্পীকার লাগিয়ে কথা বললে বেশ জোরে শোনা যায়।

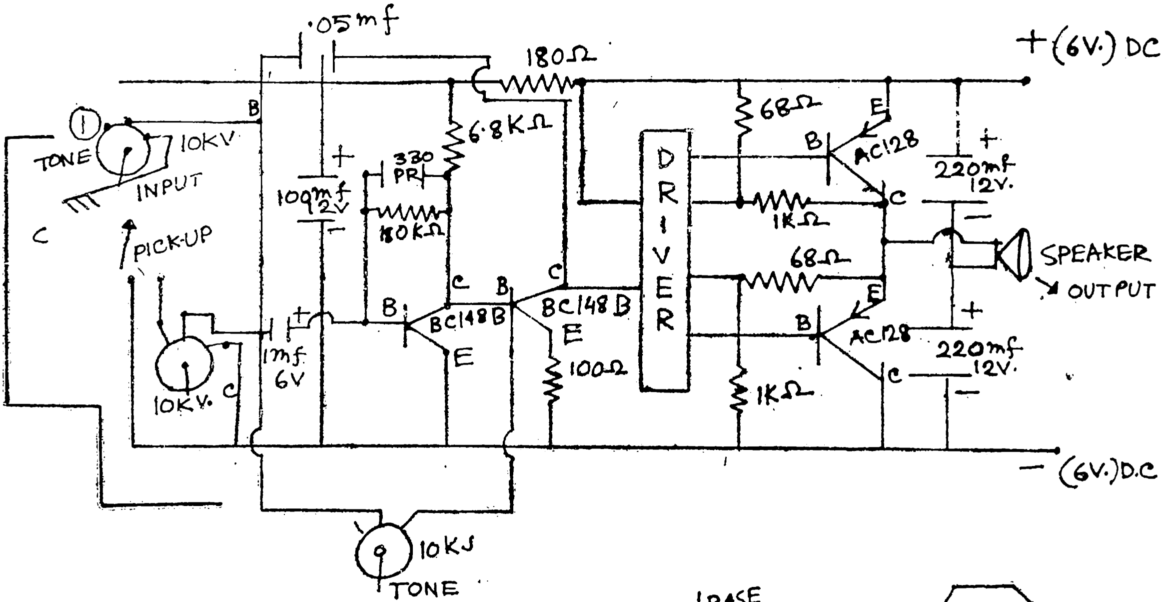

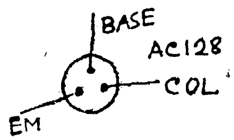

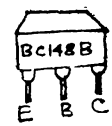

এটা টেপরেকর্ডারের স্পীকারের তার দুটির সঙ্গে pick up-এ যোগ করলে টেপরেকর্ডে যে গান হবে তা বেশ জোরে ও গমগমে আওয়াজে বাজবে। এটি কম খরচে তৈরি করা যেতে পারে।

মডেলটি তৈরি করতে যে জিনিসগুলি লাগবে।

1. 6 volt-এর driver transformer 1টা
2. Transistor Ae 128 2টা
   Be 148B 2টা
3. Condenser 220 mfd/12 volt 2টা
   1 mfd/6 volt 1 টা
   100 mfd/12 volt 1টা
   ·05 mfd 1টা

5·10KΩ volume—2টা

6 volt ব্যাটারি, 8Ω স্পীকার, 1 ফুট ব্যাস একটি চেসিস, একটা রেডিওর সার্কিট বোর্ড।

Resistance—

18KΩ—1টা, 6·8KΩ—1টা, 1KΩ 2টা, 180Ω —2টা 68Ω—2টা, 100Ω—1টা।

কিভাবে রেডিওর সার্কিট বোর্ড-এ রাঙ দিয়ে ঝালাই করবে লক্ষ কর।

CIRCUIT DIAGRAM

এইভাবে ঝালাই করলে মডেলটি হবেই-ই।

বিঃ দ্রঃ সাতট্রানজিস্টর রেডিও এর সার্কিট বোর্ড-এ পার্টসগুলি ভালভাবে বসান যাবে। বসাতেও খুব সহজ।

রাঙ, রজন ও তাতাল লাগবে।

পার্টসগুলি কলকাতার ম্যাডান স্ট্রীট অথবা চাঁদনীচকে পাওয়া যাবে।

বগুলা কলেজ পাড়া, পোঃ-বগুলা, জেলা-নদীয়া।

খেলাঘরের ব্যারোমিটার

অপরাজিত বসু

তোমরা হয়তো স্কুলে বা কলেজে পারদের ব্যারোমিটার দেখে থাকবে। এখন পারদের বদলে জল দিয়ে খেলনা-ব্যারোমিটার বানানো দেখাব।

একটা কাচের বয়ম নাও এবং তাতে কিছুটা জল ঢাল। এরপর একটা খালি কাচের ফ্লাস্ককে বয়ম-এর মধ্যে এমন ভাবে উল্টে রাখ যাতে জলের তলটা ঠিক ফ্লাস্কের মুখের মধ্যে ঢুকে থাকে এবং বয়ম-এর মুখে ফ্লাস্ক ঝুলে থাকে। জল যেন ফ্লাস্কে বেশি না ঢোকে, একটুখানি ছুঁয়ে থাকে—তা লক্ষ্য রাখবে। (ছবি দেখ) ফ্লাস্কের মুখ জলের তল ছুঁয়ে থাকবে, মাঝে যেন কোন ফাঁক না থাকে। প্রয়োজনে বয়ম-এর জল বাড়িয়ে বা কমিয়ে নাও। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল জলের ব্যারোমিটার। এবার আসল কথাটা বলি। যেদিন তুমি ব্যারোমিটার বানাবে, সেদিন যেন বৃষ্টি-বাদলা থাকে— এটা খেয়াল রেখ। শীতের দিনে বা শুকনো গরমের দিনে জলের ব্যারোমিটার বানাতে যেও না।

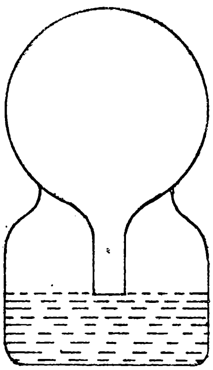

আবহাওয়ার পূর্বাভাস কিভাবে হবে? আবহাওয়া যেমন যেমন বদলাবে, ফ্লাস্কের মুখের জলের তল তেমনি ওঠা নামা করবে। যেমন, যেদিন দেখবে—

1. ফ্লাস্কের মুখ ও বয়ম-এর জলের তল পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে—অর্থ বৃষ্টি বাদল হচ্ছে। 2. ফ্লাস্কের মুখে অল্প জল উঠেছে—অর্থ, বৃষ্টি ধরে আসছে। 3. ফ্লাস্কের মুখে বেশ খানিকটা জল উঠেছে—অর্থ, পরিষ্কার আবহাওয়া হয়ে এলো। 4. ফ্লাস্কের মুখে আরো জল উঠছে—অর্থ, শুকনো আবহাওয়া চলছে। 5. ফ্লাস্কের মুখের জলের তল নামছে— অর্থ, আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে, বৃষ্টি আসছে।

কি সহজে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাচ্ছি। এবার তোমরা চেষ্টা করে দেখ।

বি 16/8, কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলি-89

পাখি

সুরজিৎ দে

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত
ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

প্রাণিজগতের মধ্যে পাখিরা এক বিচিত্র জগতের বাসিন্দা। পাখিদের জীবন সত্যিই বৈচিত্র্যময়, একের সাথে অন্যের প্রায় অমিল। তাই তাদের ঘিরে মানব সমাজের অদম্য কৌতুহল।

বর্ণ, আকৃতি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যে পক্ষিকুল 27টি পর্বে বিভক্ত, কারুর কারুর মতে 29 টি পর্ব। এর মধ্যে 166টি বংশ আছে ও এদের আবার 8600টি প্রজাতিতে ভাগ করা হয়েছে। ভারতে 70টি বংশে প্রায় 1200 প্রজাতির পাখি দেখা যায়। মূলত খাদ্য হিসাবে আমরা পাখি পুষি। শিকারীরা পাখি শিকার করে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে। বর্তমানে সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নীতি দ্বারা পাখিদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

কালের বিবর্তনে সরীসৃপই পাখিতে পরিণত হয়েছে। ডিম থেকে পাখির জন্ম। পাখির দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। এদের স্বরযন্ত্রও বহুগুণ উন্নত। স্থলজ প্রাণীদের মধ্যে পাখির রক্ত সবচেয়ে গরম।

ওড়ার সুবিধার্থে দেহটি মাকু বা নৌকোর খোলের মতো, মধ্যভাগ বেশ মোটা ও সামনের পা দুটি ডানায় পরিণত হয়েছে। সারা শরীর বহু ছোট বড় পালকে ঢাকা। হাড়—হালকা, পাতলা ও বায়ুপূর্ণ। উড্ডয়নশীল পেশীও ওড়ার কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

শুধু ওড়ার জন্যই পাখিদের লেজ ও ডানার পালক সৃষ্টি হয়নি। প্রতিকূল আবহাওয়ায়ও যাতে শরীরের উত্তাপ বজায় থাকে সেজন্যও এ ব্যবস্থা। এরা হাঁটা ও শিকারের কাজে পা, ওড়া ও লড়াইয়ের জন্য ডানা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ও শারীরিক উত্তাপ বজায় রাখতে শ্বাসযন্ত্র ব্যবহার করে।

পাখিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ওড়া হলেও সব পাখি কিন্তু উড়তে পারে না। উট, এমু, রিয়া প্রভৃতি তার উদাহরণ। এছাড়াও এদের আছে আরো নানা বিশেষত্ব। আর্কিওপটেরিক্সের মধ্যে পাখি ও সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পাখি সাঁতারে খুবই দক্ষ। এরা জোড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে ও স্বয়ংবর সভা থেকে বিয়ে করে। কিউই পাখির ডানা ও লেজ কোনটাই নেই। সামুদ্রিক পাখি আলবাট্রসের ডানা সবচেয়ে বড়।

প্রঃ করুণাময় দাস গ্রামঃ—উটপাখর পোঃ—নিমপুরা। জেলা ঃ মেদিনীপুর

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গতমাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর
এয়ার পকেট কি ?

পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুস্তরে মাঝে মাঝে বেশ কিছু অঞ্চল জুড়ে বায়ুর স্বাভাবিক স্তরটা হালকা ও পাতলা হয়ে ওঠে। অনুরূপ অবস্থা এলে ঐ অঞ্চলটার বায়ু কতকটা অস্থির হয়ে উঠে এবং কুণ্ডলীর আকারে একটা নিম্নাভিমুখী আবর্তের সৃষ্টি করে। এটি সাধারণত ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত বায়ুর উষ্ণতার তারতম্যর জন্যে হয়ে থাকে ।

নিম্নাভিমুখী আবর্ত সৃষ্টি হলে উক্ত অঞ্চলে যা কিছু আসুক না কেন সেটি প্রবল বেগে ভূপৃষ্ঠের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। বিশেষতঃ কোন বিমান যদি ঐ অঞ্চলে এসে যায় তাহলে বিমানটির বাঁচার কোন উপায় থাকেনা। আবর্তের মধ্যে পড়ে সজোরে নিক্ষিপ্ত হবে নিচের দিকে।

অতি ভয়াবহ উক্ত অঞ্চলকে বলা হয় এয়ার পকেট। এটি সাময়িকভাবে অধিক শৈত্যযুক্ত অঞ্চলে মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়। অনেকটা প্রতীপ ঘূর্ণবাতের মতই ব্যাপারটা ঘটে।

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন
ঊষা ও গোধূলির আকাশ লাল দেখায় কেন ?

প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন—সুদীপ রাউত—আঠিলাগড়ি-কাঁথি, মেদিনীপুর।

প্রঃ চাঁদের চারদিকে মাঝে মাঝে গোলাকার বলয় কেন দেখা যায় ? সমৃত কুমার বাউড়ি, সরবেড়িয়া-চোর-পাহাড়ী, পুরুলিয়া। সৌরজগতে গ্রহ ও উপগ্রহদের কেমন করে সৃষ্টি হয়েছে ? হিরণ্ময় কোঙার, বিরুডিহা বর্ধমান। চুল পাকে কেন ? 1. সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, নবদ্বীপ, নদীয়া এবং 2. সুদীপ্ত সেনগুপ্ত, রামপুরহাট, বীরভূম। মানুষের আত্মা কি সত্যই আছে ? অখিলচন্দ্র ভক্ত ও নিখিলচন্দ্র ভক্ত, উত্তর বাসুদেবপুর, বেলাবেড়িয়া, কলিকাতা-56। ধূমকেতু সম্বন্ধে নানা ধরনের প্রশ্ন রেখেছো—1. সমরেন্দ্রনাথ বসু, খাজুর নাম, মুগকলোনি, হাওড়া ; 2. শ্যামসুন্দর মণ্ডল, করিমপুর, লক্ষ্মীপাড়া, নদীয়া ; 3. সুদীপ্ত কর্মকার, মঙ্গলবাড়ী, মালদা। পেঁচা দিনের বেলায় কেন দেখতে পায় না ? প্রতাপ হাজারী, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, মিলন চ্যাটার্জী, দুর্গাপুর-3।

এক বছরের মধ্যেই তোমাদের অধিকাংশ উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এত স্বল্পকালের ব্যবধানে কেমন করে উত্তর দিই বল ? একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তে এ সব প্রশ্নের পুনরায় উত্তর দেওয়া যাবে।

প্রঃ নিকোটিনিক অ্যাসিড কী ? কোথা থেকে পাওয়া যায় এবং এর উপকারিতা কি ? অসীমকুমার পাল, কাদিহাট, বেলবাড়ী, পঃ দিনাজপুর।

উঃ নিকোটিনিক অ্যাসিডকে নিয়াসিনও বলা হয়। মাছ, মাংস, দুধ, ঈস্ট, ঢেঁকিছাঁটা চাল, যাঁতায় ভাঙ্গা গম, অঙ্কুরিত ছোলা এবং শুঁটি জাতীয় শস্যে ট্রিপটোফেন নামক একজাতীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। উক্ত অ্যাসিড বিপাক-ক্রিয়ায় নিকোটিনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় একটি ভিটামিন এবং এর অভাব ঘটলে পেলেগ্রা নামক রোগটি হয়ে থাকে। ভুট্টায় ট্রিপটোফেন না থাকায় ভুট্টা যাদের প্রধান খাদ্য তাদের মধ্যে উক্ত রোগটি বেশি দেখা যায়। এর অভাবে উদরাময়, নানা মানসিক রোগ ও চর্মরোগও হয়ে থাকে। শরীরে প্রতিদিন প্রায় 12 মিলিগ্রামের মত উক্ত অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়।

প্রঃ রেডিওর শব্দ আলোকের গতিতে আসে কেমন করে ? উপল কান্তি মণ্ডল, তারাপুর, বীরভূম।

উঃ বেতার রশ্মি আলোকের মতই বিদ্যুৎ-চৌম্বক রশ্মি। এবং গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সমান। রেডিওতে বিভিন্ন প্রচার তরঙ্গে যে সব বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গকে ব্যবহার করা হয় সেইসব বেতার তরঙ্গের মাধ্যমেই শব্দকে প্রেরণ করা হয় এবং গ্রাহক যন্ত্রে বেতার তরঙ্গ থেকে শব্দকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়। উক্ত কারণে এখানকার শব্দ আলোকের সমান গতিবেগ প্রাপ্ত হয়।

প্রঃ ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত চাকী কী সত্য ? আশিস মিশ্র, আসানসোল-2।

উঃ উড়ন্ত চাকী কল্পবিজ্ঞানের এক উদ্ভট পরিকল্পনা। ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান জীবরা নাকি ঐ যানটি (?) ব্যবহার করে দিকে দিকে ছুটে যায় এবং পৃথিবীতেও নাকি হানা দেয়। এটি নিছক একটি ধাপ্পা।

তোমার অপর প্রশ্ন মহাজাগতিক রশ্মির জন্য পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি দেখ।

প্রঃ শীতকালে নারিকেল তেল জমে যায় কেন? **স্বরূপকুমার পাত্র, দেরিয়াচক, এস. এ. বিদ্যাপীঠ, মেদিনীপুর এবং প্রীতিরঞ্জন পাত্র, আনন্দগড়, হুগলী।**

উঃ নারিকেল তেলে সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রাধান্য থাকায় শীতকালে জমে যায়। তোমার অপর একটি প্রশ্ন ক্লোরিনের পারমাণবিক ওজন ভগ্নাংশ কেন—এর উত্তরের জন্য গত বছরের ফেব্রুয়ারী সংখ্যাটি দেখ।

প্রঃ আপেলে কোন্ অ্যাসিড বিদ্যমান? আলোদীপা লাহা, আলিগ্রাম, বর্ধমান।

উঃ ম্যালিক অ্যাসিড।

প্রঃ D.D.T. কি মাটিতে স্থায়ী প্রতিক্রিয়া ঘটায়? বিপুল আচার্য, দিনহাটা, কোচবিহার।

উঃ হ্যাঁ, ঐ প্রতিক্রিয়া 25 বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয় বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। আর ঐ প্রতিক্রিয়ার ফল মাটি থেকে উদ্ভিদদেহে এবং উদ্ভিদদেহ থেকে প্রাণীদেহে সঞ্চারিত হয়। যার জন্য নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কতকগুলো দেশ এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে এখনও এর ব্যবহার অব্যাহতই আছে।

প্রঃ D.N.A.-র পুরো নাম কী? রাজা ভট্টাচার্য। 114 এ, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা।

উঃ ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড।

প্রঃ বস্তুর প্লাজমা অবস্থা কী? সুদীপ রায়চৌধুরী, কলিকাতা।

পদার্থের তিনটি অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থা; কি আছে? সেটি কেমন? সোমা মল্লিক, তেহট্ট, নদীয়া।

উঃ পদার্থের সাধারণত তিনটি অবস্থা। যথা কঠিন' তরল ও বায়বীয় অবস্থা ছাড়া আর একটি অবস্থা আছে। এটিকে বলা হয় চতুর্থ বা প্লাজমা অবস্থা।

আমরা জানি, তাপ প্রয়োগের ফলে যে কোন কঠিন পদার্থ তরলে রূপান্তরিত হয় এবং তরলকে আরও তাপ প্রদান করলে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। তেমনই তাপ হ্রাস করতে থাকলে গ্যাস প্রথমে তরলে ও পরে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই তিনটি অবস্থাই পদার্থের সাধারণ অবস্থা।

কিন্তু জানা গেছে, গ্যাসের তাপমাত্রাকে যদি প্রচণ্ডভাবে বাড়ানো যায় (বায়ুর ক্ষেত্রে প্রায় দশ হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড এবং কোন কোন গ্যাসের ক্ষেত্রে উক্ত তাপমাত্রার দ্বিগুণ) তাহলে গ্যাসীয় অণু ও পরমাণুর গতি ভয়ানকভাবে বেড়ে যায় এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে পরমাণুর বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। অনুরূপ অবস্থায় পরমাণুগুলো থেকে ইলেকট্রনরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তড়িৎসাম্য নষ্ট হওয়ায় মূল পরমাণুটি ধনাত্মক আধানযুক্ত হয়ে পড়ে। তাপমাত্রা আরও বাড়াতে থাকলে গ্যাসের মধ্যে ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রনের সংখ্যা যেমন ধীরে ধীরে বেড়ে চলে তেমনই গ্যাস মধ্যস্থিত ধনাত্মক আধানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। শেষে এমন এক অবস্থায় আসে যখন গ্যাসের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করে মুক্ত ইলেকট্রন কণিকা ও ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট কণিকা। গ্যাসের অনুরূপ অবস্থাকেই বলা হয় প্লাজমা বা চতুর্থ অবস্থা।

প্লাজমার দুটি স্তর। কোন গ্যাসের সমূহ পরমাণু যদি বিয়োজিত হয়ে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন বলা হয় "সম্পূর্ণ আয়নিত প্লাজমা" এবং বিয়োজন সম্পূর্ণ না হয়ে যদি কিছু তড়িৎ নিরপেক্ষ পরমাণু থেকে যায় তাহলে তাকে বলা হয় "আংশিক আয়নিত প্লাজমা"। প্রকৃতপক্ষে বিয়োজন সম্পূর্ণ হলেই গ্যাসের প্লাজমা স্তর আসে। অনুরূপ অবস্থায় ধনাত্মক আধান ও ঋণাত্মক আধান পৃথক পৃথক ভাবে গ্যাসের মধ্যে অবস্থান করলেও পরীক্ষা করলে গ্যাসটিকে তড়িৎ নিরপেক্ষ দেখা যাবে। বিজ্ঞানীদের মতে প্লাজমাও পদার্থের শেষ অবস্থা নয়। পঞ্চম অবস্থাও সম্ভব।

প্রঃ অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি কি কি? অঞ্জন ঘোষ, নিমপাড়া, খড়্গপুর।

উঃ লাইসিন, মিউসিন, থ্রিয়োনিন, মিথিওনিন, ট্রিপটোফেন, ভ্যালিন, ফেনাইল এলানিন, আরজিনিন ও হিসটিডিন। শেষের দুটি কেবল শিশুদের বেলায় অপরিহার্য, বয়স্কের ক্ষেত্রে নয়।

প্রঃ মাকড়সার জাল কী ধরনের জিনিস? বিকাশচন্দ্র ঘোষ, কদুবাড়ী রোড, গাজোল, মালদা।

উঃ মাকড়সার জালের উপাদান ফাইব্রাইন নামে এক প্রকার প্রোটিন। মাকড়সাদের পেছনে চারটি কিংবা ছ'টি গ্রন্থি থেকে তরল পদার্থ নিঃসরণ ঘটে। গ্রন্থির মুখে থাকে স্পিনারেট নামে ছোট্ট মুখওয়ালা যন্ত্র। আবার ঐ যন্ত্রে থাকে কয়েকশ' সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম নল। গ্রন্থিগুলি থেকে তরল নিঃসরণের পর সূক্ষ্ম নলের মাধ্যমে সেগুলি বেরিয়ে আসে এবং বাইরের বায়ুর সংস্পর্শে এলেই শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। যেহেতু শক্ত হতে একটু সময় লাগে, তাই একটি সূতার সঙ্গে অপরটি জোড়া লেগে জালের আকার ধারণ করে। এই জাল বেশ চটচটে। কিন্তু মাকড়সার পায়ে এক ধরনের পিচ্ছিল পদার্থ থাকায় তারাই অক্লেশে জালের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। অথচ পোকামাকড়রা জালে আটকে যায়।

প্রঃ রেডারের পুরো নাম কী? সুমন মুখোপাধ্যায়, খড়্গপুর।

উঃ Radio Detection and Ranging.

প্রঃ হাজার দুয়ারীর কাছে একটি কামান দেখলাম তাতে মরিচা পড়েনি। শুনলাম বিষ্ণুপুরের দলমাদল

কামানেও মরিচা পড়েনি। কেন? মিত্রা কুণ্ডু, 90, এস. এল. বোস রোড, দুর্গাপুর-5।

উঃ ঐ কামানগুলি, দিল্লীর লৌহস্তম্ভ, কোনারকের সূর্যমন্দিরের কড়ি ইত্যাদি অতীত ভারতের লৌহ শিল্পের নিদর্শন। বর্তমানে কলঙ্কহীন ইস্পাত তৈরির জন্য বিজ্ঞানীরা কতই না হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। অথচ সুদূর অতীতে ভারত যে কলঙ্কহীন ইস্পাত তৈরি করতে পারতো তারই নিদর্শন এগুলি। কিন্তু সে পদ্ধতিগুলি আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের অযোগ্যতার ফলে। শুধু পতঞ্জলির "লৌহশাস্ত্র" থেকে জানা যায়, ছোট ছোট কাঠকয়লার চুল্লীতে লৌহ পাথর গলিয়ে অনুরূপ ইস্পাত তৈরি করা হতো।

প্রঃ গ্রহসৃষ্টির মতবাদগুলি কি কি? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণা কেমন করে জোড়া লেগে এত বড় বড় গ্রহকে সৃষ্টি করেছিল? পার্থসারথি মণ্ডল, 6 নং গড়ফা মনসাতলা রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-75।

উঃ গ্রহসৃষ্টির মতবাদগুলি '৪৬-র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বলা হয়েছে। পণ্ডিতদের ধারণা, সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন বলয় যখন ক্রমান্বয়ে দূরে দূরে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তার দেহ থেকে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু তেলতেলে হাইড্রোকার্বন কণাও ছিল। অন্যান্য কণা সহ বৃত্তাভাস পথে সূর্যকে পরিক্রমা করতে গিয়ে সংঘর্ষের ফলে এগুলোও একত্রিত হয়েছিল এবং এদের উপস্থিতির জন্যই জোড়া লাগতে সুবিধা হয়েছিল।

প্রঃ—অ্যাসকরবিক অ্যাসিডের ফরমূলা কি? সুখেন্দু ভট্টাচার্য। রঘুনাথচক, বল্লভপুর, বর্ধমান।

(প্রাণিদেহে জারিত ভিটামিন বা ডিহাইড্রো অ্যাসকরবিক অ্যাসিডে ফরমূলা)

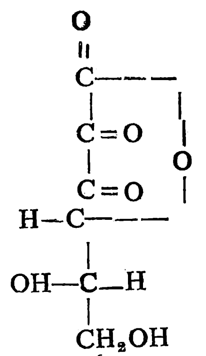

প্রঃ পাতিলেবু ও কাগজিলেবুর মধ্যে কোনটিতে বেশী ভিটামিন থাকে? পঙ্কজ দেব নওগাঁ, আসাম।

উঃ সব লেবুতেই সমান উপাদান থাকে। তবে টাটকা অবস্থায় উপাদান গুলি যত থাকে. কিছুদিন রেখে দিলে ঘাটতি ঘটে যায়। যে কোন লেবুতে একমাত্র খাদ্যপ্রাণ A ছাড়া প্রায় সব উপাদানের কিছু কিছু বিদ্যমান। তোমার আর একটি প্রশ্ন—"ধূমপানে দাঁতের গোড়ায়, জিভে, পাকস্থলীতে শ্বাসনালী ও গ্রাসনালীতে ক্যানসার নামক দূরারোগ্য ব্যাধি হওয়ার সম্ভবনা।

প্রঃ কারবোহাইড্রেট ও ফ্যাটের মূল উপাদানগুলি কি, কি? কারবো হাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট শরীরে কোন্ কোন্ সরলতম উপাদানে রূপান্তরিত হচ্ছে! ওদের সঙ্কেত কি কোন কোন খাদ্যে অধিক কারবোহাইড্রেট ও ফ্যাট থাকে। (১) প্রসাদ চক্রবর্তী, নিউকলেজ পাড়া ইন্দিরা কলোনী-রায়গঞ্জ-পশ্চিম দিনাজপুর। (২) দিলীপ দাস, খড়্গপুর-মেদিনীপুর।

উঃ কারবোহাইড্রেট ও ফ্যাটকে বিশ্লেষণ করলে, কাবরন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায় অর্থাৎ উভয়েই কারবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগ। কারবোবাইড্রেট গ্লুকোজের আকারে, প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডের আকারে এবং ফ্যাট ফ্যাটি অ্যাসিডের আকারে সরলতম যৌগে রূপান্তরিত হয়। নানা ধরণের ফ্যাটি অ্যাসিডের একটি পামিটিক অ্যাসিড CH_3-(CH_2) ॥—CH_2 CH_2—CH_2COOA। অ্যামিনো অ্যাসিড জটিল জৈব যৌগ। অপরিহার্য আটটি অ্যামিনো অ্যাসিডের অন্যতম আর জিনিনের সর্বাধিক সমৃদ্ধ

ফরমূলা :— গ্লুকোজ :—

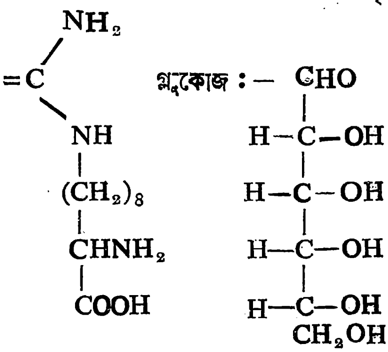

খাদ্য ঘি (100%), মাখন 81%। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে চীনবাদামে 40·1% কারবোহাইড্রেট কলে ছাঁটা চালে থাকে 79% এবং ময়দায় থাকে 73·9% কারবোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট সমৃদ্ধ খাদ্য সয়াবিন ও চীনাবাদাম। সয়াবিন প্রোটিন 43·2%, ফ্যাট 19·5% ও কারবোহাইড্রেট 20·9% এবং চীনা বাদাম। প্রোটি 25·3%, ফ্যাট 40·1% ও কারবোহাইড্রেট 26·1%। একমাত্র খাদ্যপ্রাণ C ছাড়া সব উপাদানই ঐ দুধের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ রয়েছে। তবে ভাজা অবস্থায় নয় জলে ভেজানো অবস্থায়। সর্বাধিক কারবোহাইড্রেট ও ফ্যাট দুটি একত্রে পাওয়া যায় ঝুনা নারিকেল।

কালিন্দী, মেদিনীপুর

অরুণাচলে সমুদ্র রাজস্থানে জল

অরুণাচল প্রদেশে আগে সামুদ্রিক পরিমণ্ডল ছিল এবং রাজস্থানে আগে একেবারে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যেতো, একথা তোমরা কি বিশ্বাস করতে পারছো ? লাক্ষ্ণৌ-এর Birbal Sahni institute of Plaeobotany-র বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, অরুণাচল প্রদেশে তাঁরা কতকগুলি কয়লার বল পেয়েছেন। প্রাচীন এই কয়লার বল পরীক্ষা করে ঐ অঞ্চলে 25 কোটি বছর আগে সমুদ্র ছিল, এমন আভাষ পাওয়া গেছে। রাজস্থানের ফসিল বা একটা জীবাশ্ম থেকে গবেষণার ফলে তাঁরা রাজস্থানে 5-কোটি বছর আগে জলের অস্তিত্বের কথা জানতে পেরেছেন। অথচ এখন এই রাজস্থানের মরুভূমি দেখলে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাববে পৃথিবীতে যতই দিন যাচ্ছে, ততই কি কাণ্ড কারখানাই না ঘটছে !

চীনে দীর্ঘজীবি মানুষ

এখন ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষের আয়ু দিন দিন কমে যাচ্ছে। অথচ এই পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। চীন হল এমন একটা দেশ। এই চীনে একশো বছরের বেশী বেঁচে আছেন এমন লোকের সংখ্যা বলতে গেলে অনেক। সুতরাং শতায়ু লোকের সংখ্যা হয়ত চীনেই সবচেয়ে বেশী। সেখানকার সিনকিয়াং ও তিব্বতের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলেই বেশীর ভাগ লোকের বয়স একশো বছর বা তার বেশী। দক্ষিণ-চীনের কুয়াংঘি অঞ্চলে এই ধরণের মানুষের সংখ্যা দুশোর কিছু বেশী। সেদেশের 1982 সালের লোক গননাও এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এইসব লোকদের দীর্ঘজীবি হবার কারণ কি ? বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে সম্প্রতি গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে ঐ অঞ্চলের মাঝারি আবহাওয়া এঁদের দীর্ঘজীবি হতে সাহায্য করেছে। এঁরা সাধারণতঃ আঁশযুক্ত ও কম চর্বিযুক্ত খাবার খেয়ে থাকেন। এই সব খাদ্যও আবহাওয়া তাঁদের দীর্ঘজীবি হবার সহায়ক হয়েছে। আর এরা কিন্তু কম কর্মঠ নন।

প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ক্যালেণ্ডার

মহেঞ্জোদাড়োতে সিন্ধু সভ্যতার আমলের মানুষের প্রাগৈতিহাসিক ক্যালেণ্ডার তৈরী মানুষের প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা বলে অনেকে মনে করেন। অন্ততঃ ফিনল্যাণ্ডের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক ডঃ এররাকা মউলা একথা জানিয়েছেন। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার যে উন্নত সভ্যতার নিদর্শনের কথা আমরা জানি, তার মধ্যে আগে সেখানকার লোকেদের পাথরের তৈরী ক্যালেণ্ডার বর্ষা, বন্যা এবং ঐ ধরণের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্বাভাষ জানার জন্য তাঁরা পাথরের ক্যালেণ্ডার তৈরী করেন। ঐসব ক্যালেণ্ডারে কৃষি, শিকার প্রভৃতির সময়, জাপন করা থাকতো। তখনকার লোকেদের জীবন যাত্রায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিশেষ প্রভাব ফেলতো। তাই সময় হিসাবে করে তাঁরা এ সম্পর্কে ক্যালেণ্ডার তৈরী করতেন সকলের জানার জন্য। তবে এখনকার ক্যালেণ্ডারের মত কিন্তু তাঁদের ক্যালেণ্ডারে দিন মাস ও বছরের হিসাবে ওতে থাকতো না। তবুও গোলাকার রিং এর মতো ঐ ক্যালেণ্ডার তাঁদের কাছে ছিল খুবই মূল্যবান।

বিচিত্র পাখী

ইন্দোনেশিয়া আর অস্ট্রেলিয়াতে মেগাপোডেস (Megapoes) নামে সুন্দর দেখতে এক ধরনের পাখী আছে। এই পাখী ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিমের ওপর বসে তা দেয় না। তবুও তাদের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। অন্যান্য পাখীদের তুলনায় এদের এখানেই ব্যতি-

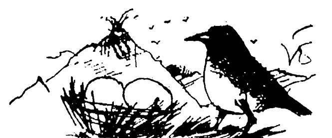

ক্রম। আদিম সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর বৈশিষ্ট্যজাত এই পাখীরা প্রাকৃতিক তাপকে কাজে লাগিয়ে তাদের ডিম ফোটায়। ইন্দোনেশিয়াতে আগ্নেয়গিরির অদূরে নিরাপদ জায়গায় এই পাখীগুলো ডিম পাড়ে। আগ্নেয়গিরি থেকে ডিম ফোটানোর উপযুক্ত তাপ তারা পেয়ে যায়। আর তা থেকেই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

অস্টেলিয়ার এই পাখীরা প্রায় 10 মিটার ব্যাসের ছোট পাহাড়ের মত করে বাঁসা বাঁধে। বাসার আচ্ছাদন হিসাবে তারা যে পাতা ব্যবহার করে ডিমগুলোর প্রয়োজন অনুযায়ী তা সরিয়ে দেয় বা জড়ো করে। ভেতরে যে তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়। তা থেকেই ডিম ফুটে পাখীর বাচ্চা বেরিয়ে আসে।

বরুণ মজুমদার

এক ডজন নতুন বই

পাঁচটি কিশোর ক্ল্যাসিকস্

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ বিন্নি ধানের খই ৮৲
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ কিশোর গল্প সমগ্র ৩০৲
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ প্রেতাত্মার প্রতিশোধ ৮৲
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ হারানো কাকাতুয়া ১০৲
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০৲

পাঁচটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

সমরজিৎ কর ॥ পরমাণু প্রসঙ্গ ১৫৲
জয়ন্ত বসু ॥ পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় ১৫৲
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস্ ১০৲
পার্থসারথি চক্রবর্তী ॥ বুদ্ধি নিয়ে খেলা ১০
বিমান বসু ॥ নক্ষত্র পরিচয় ১০৲

এবং দুটি অতি প্রয়োজনীয় বই

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস বুক অফ নলেজ ৫০

অমরনাথ রায় সম্পাদিত

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

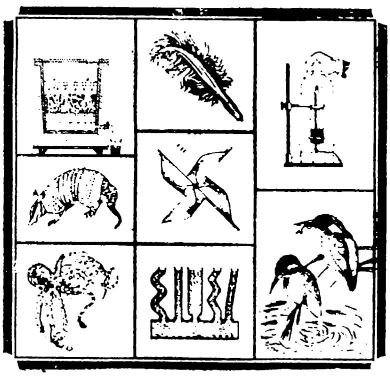

ছোটদের বইয়ের স্বপ্ন রাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

ছোটদের জন্যে কলম ধরেছেন বর্ষীয়ান লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ…

কারণ আজকের দিনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পড়তে হয় অনেক বই। শুধু সিলেবাসের পড়া সম্পূর্ণ করার জন্যই নয়, অজানাকে জানার আগ্রহ ও তাদের খুব। অথচ স্কুলের ছেলেমেয়েদের অসীম কৌতূহল মেটাতে পারে এমন প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুবই অল্প। তাই ছোটদের জন্যে বিশেষতঃ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য একখণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সাধারণ জ্ঞানের বই (বুক অব নলেজ) প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যে পরিকল্পনাকে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন কুড়িজন সেরা লেখক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ যাঁদের লেখার সঙ্গে ছোটরা বিশেষভাবে পরিচিত।

বিচিত্র এই পৃথিবী গঠন কেমন, কবে কিভাবে পৃথিবীর বুকে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছিল—সেইসব বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের পর কিভাবে আবির্ভাব হল মানুষের ? মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসও বড় রোমাঞ্চকর ইতিহাস। এই পর্যায়ে লিখবেন :

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু পাত্র, সলিল রাহা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ধীরেন্দ্রলাল ধর ও নারায়ণ সান্যাল।

শিল্প ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে চলল বিজ্ঞানের জয়রথ। গুহাবাসী মানুষের আগুনের ব্যবহার থেকে শুরু করে আজকের মানুষ এসে পৌঁছেছে ইলেকট্রনিক্স-এর যুগে। শুধু পৃথিবীর বুকেই মানুষ নিজেকে আটকে রাখেনি, পাড়ি জমিয়েছে মহাকাশের বুকে, অভিযান চালিয়েছে সমুদ্রের অতলে। আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছে তার আনন্দের উপকরণও। বিজ্ঞানের গবেষণা ও সাফল্যের আনুপূর্বিক বিবরণ লিখবেন : **ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অমরনাথ রায়, অজয় চক্রবর্তী, বিমান বসু, সমরজিৎ কর, সিদ্ধার্থ ঘোষ, অজয় দাশগুপ্ত, সুবীর দত্ত, সিদ্ধার্থ রায়, অমিত চক্রবর্তী, রজত রায় এবং পার্থসারথি চক্রবর্তী।**

আর কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের এই সুজলা সুফলা পৃথিবীর ? এবং আমাদের এই বর্তমান পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ পরিণতিই বা কী—এ নিয়ে লিখবেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার।

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস বুক অব নলেজ

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 7 th Yr Vol – 2 · JUNE – 1987/Regd. No. WBEC/255

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন	লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	সায়েন্স ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী	ফিজিক্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য	গণিত ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	নলেজ ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ । প্রতিটি ১০ টাকা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২ দাম ঃ 4·00 টাকা।